ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬১ বর্ষ ১২ সংখ্যা ।। ৮ অগ্রহায়ণ, ১৪১৫ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১০) ২৪ নভেম্বর, ২০০৮ ।। Website : www.eswastika.com

জনজাতিরা ক্ষেপে গেলে সি পি এমকে ভুগতে হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। সিপিএমের বিরুদ্ধে জনজাতি তথা এই ক্ষোভ সামাল দেওয়া মুশকিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। গত ৩০ বছরের অপশাসনে সিপিএমের নেতা-মন্ত্রীরা যে নিজেরা ফুলে ফেঁপে উঠছে তা এইসব ঘটনা থেকেই প্রমাণ হচ্ছে। জনজাতিরাই ছিল সিপিএমের ভোট ব্যাঙ্ক রাজনীতির অন্যতম হাতিয়ার। জনজাতি সমাজের উন্নতিতে বামপন্থীরা যে কিছুই করেনি তার প্রমাণ রাজ্যের ৪৬১২টি পিছিয়ে পড়া গ্রাম। এই অনাহার পীড়িত গ্রামগুলির অধিকাংশই জনজাতি অধ্যুষিত। মনে রাখতে হবে, সিপিএম জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলি থেকেই সবচেয়ে বেশি ভোটে জিতে এসেছে। ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, বোলপুর আসনগুলিতে সিপিএমের ভোটের ব্যবধান তিন চার লাখের বেশি। কিন্তু জনজাতিরা এখন সিপিএমের আসল রূপ চিনতে পেরেছে। সাধারণত এরা সহজ, সরল হয়। কিন্তু খেপে গেলে কী ভীষণ রূপ এরা নিতে পারে তার প্রমাণ মিলেছে লালগড়ের আন্দোলনে। এখন লালগড়ের আন্দোলন আর একটি জেলাতে সীমাবদ্ধ নয়। যেখানেই জনজাতিরা রয়েছে সেখানকার জনতাই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। ১৬ নভেম্বর হুগলি, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমানের বিস্তীর্ণ এলাকায় এর প্রভাব দেখা দিয়েছে। ঝাড়খণ্ড দিশম পার্টির ব্যানারে ডাকা বন্‌ধে রাজ্যের রেল পরিষেবা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। চাষিদের পর এবার যে জনজাতিরাও সিপিএমকে দেখে নেওয়ার জায়গায় চলে যাচ্ছে তা এই ঘটনাতেই স্পষ্ট।

সশস্ত্র জনজাতি মহিলাদের টহল।

জনজাতিরা তাদের বন্ধু চিনে নিতে ভুল করে না। যারা প্রকৃতই জনজাতিদের উন্নয়নে কাজ করে তাদের সঙ্গে সমস্ত রকম সহযোগিতা করে তারা। জঙ্গলমহলের জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় বনবাসী কল্যাণ আশ্রম স্কুল করেছে, হস্টেল চালায়, সেখানে কোনওদিন অশান্তি হয়নি। ওড়িশায় কন্ধমালে লক্ষ্মণানন্দ সরস্বতী খুন হওয়ার পর জেলার জনজাতিরা এককাট্টা হয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে। সেখানে খৃস্টান মিশনারিদের দশা সিপিএম কী দেখেও দেখেনি? জনজাতিরা খেপে গেলে এমনই হয়। লালগড়ে তো কিছুই হয়নি। বঞ্চনার প্রতিবাদে হিংস্র হলে জনজাতিরা তীর চালাতে পিছপা হয় না। এতদিন ভুল বুঝিয়ে সিপিএম যে তীর চালাত এখন তা ব্যুমেরাং হয়েছে।

ভুবনেশ্বরে লক্ষাধিক হিন্দুর দাবি

স্বামী লক্ষ্মণানন্দের হত্যাকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার চাই

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। স্বামী লক্ষ্মণানন্দ সরস্বতীর হত্যাকারী ও মূল ষড়যন্ত্রকারীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে উত্তাল হয়ে উঠল ভুবনেশ্বর। গত ১৫ নভেম্বর ভুবনেশ্বরে স্বামী লক্ষ্মণানন্দ সরস্বতী শ্রদ্ধাঞ্জলি সমিতির আয়োজিত বিশাল জনসমাবেশে দাবি ওঠে — স্বামীজির হত্যার মূল ষড়যন্ত্রকারী হিসাবে বিজু জনতা দলের সাংসদ রাধাকান্ত নায়েক, কটক-ভুবনেশ্বরের আর্চ বিশপ রাফেল চিনাথ এবং ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন কাউন্সিল-এর সদস্য জন দয়াল-কে গ্রেপ্তার করতে হবে। সেইসঙ্গে এদের নার্কো অ্যানালিসিস টেস্টেরও দাবি জানানো হয়। স্বামী লক্ষ্মণানন্দ-এর প্রতি ওড়িশার মানুষের ভাবাবেগ যে কত প্রবল, লক্ষাধিক হিন্দুর এই বিরাট জনসভাই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এদিন ভুবনেশ্বরের আকাশ বাতাস স্লোগানে স্লোগানে ভারি হয়ে উঠে। মুহুর্মুহ স্লোগান উঠে — স্বামী লক্ষ্মণানন্দজী অমর রহে, ভারতমাতা কী জয়। এদিন সভায় ভীড় এতটাই হয়েছিল যে তা মাঠ ছাপিয়ে মহাত্মা গান্ধী মার্গও ভরে যায়। আগের দিন অর্থাৎ ১৪ নভেম্বর শুক্রবারই পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি লোক ওড়িশার জেলা জেলা থেকে ভুবনেশ্বরে পৌঁছে যান।

শ্রদ্ধাঞ্জলি সমিতির যুগ্ম সংযোজক ডঃ লক্ষ্মীকান্ত দাস জানিয়েছেন, হাজার হাজার মানুষ পায়ে হেঁটে, সাইকেলে, মোটর সাইকেলে কেন্দ্রপাড়া, জগৎসিংপুর, ঢেঙ্কানল, পুরী, খুরদা, নয়াগড় থেকে এসে পৌঁছান। কটক থেকে ১৫ নভেম্বর সকালে ১০০ মোটরবাইক এসে সভাস্থলে পৌঁছায়। সভার উদ্যোক্তারা এজন্য তাঁদের যাবতীয় বন্দোবস্ত করেন। এখানে উল্লেখ্য, এবছর জন্মাষ্টমীর দিন ২৩ আগস্টরাত্রে খৃস্টান সন্ত্রাসবাদীরা আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে কন্ধমাল, জেলার জলসপেটা কন্যাশ্রমে স্বামী লক্ষ্মণানন্দ ও তাঁর অন্য চারজন শিষ্য-শিষ্যাকে সামনাসামনি গুলি করে হত্যা করে। রাজ্য সরকার ঘটনার দায় মাওবাদীদের উপর চাপিয়ে দিয়ে এতদিন কোনও বড় সভার অনুমতিও দেয়নি। হত্যার অব্যবহিত পরে কন্ধমাল জেলা জুড়ে দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়।

এদিন এই বিশাল সভার মঞ্চে কোনও রাজনৈতিক নেতা নয়, ছিলেন সাধু সন্তরা। উপস্থিত ছিলেন বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের অখিল ভারতীয় সভাপতি জগদেবরাম ওঁরাও, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় মার্গদর্শক মণ্ডলীর ডঃ রামবিলাস বেদান্তী, কেন্দ্রীয় সম্পাদক রাঘবালুজী, ওড়িশা রাজ্য সম্পাদক গৌরীপ্রসাদ রথ এবং হিন্দু জাগরণ মঞ্চের সর্বভারতীয় সংযোজক হরিহর নন্দ প্রমুখ। শ্রীরথ বলেন, স্বামীজীর হত্যাকাণ্ডের ৮০ দিন পরেও সরকার হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার করতে পারেনি। সরকার এদেশীয় ও বিদেশী খৃস্টানদের চাপে হত্যাকারীদের আসল স্বরূপ প্রকাশ করছে না।

ভুবনেশ্বরে স্বামী লক্ষ্মণানন্দ সরস্বতীর শ্রদ্ধাঞ্জলি সভায় মঞ্চে সন্ত-মহাত্মারা।

স্বামী জীবনচৈতন্য মহারাজ বলেন, জগন্নাথের মাটিতে সর্বজনশ্রদ্ধেয় একজন হিন্দু সন্ন্যাসীর বর্বর-নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে ওড়িশার জনমানস ব্যথিত। লোকের ক্রোধ-আক্রোশ বাড়ছে। যতদিন না হত্যাকারীদের ধরা হচ্ছে, ততদিন আন্দোলন চলতে থাকবে।

খৃস্টানী ষড়যন্ত্রের স্বরূপ উন্মুক্ত করে একজন বক্তা বলেন, নানের

(এরপর ১৬ পাতায়)

খোদ সিমি সভাপতির স্বীকারোক্তি মালেগাঁও কাণ্ড তাদেরই

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। সিমি'র (স্টুডেন্ট ইসলামিক মুভমেন্ট অফ্ ইন্ডিয়া) সভাপতি সফদর নাগোরি নারকো অ্যানালিসিস্ টেস্টে স্বীকার করে নিয়েছেন — তাঁর দলই ইউ পি-এ আমলে দেশজুড়ে ধারাবাহিক বিস্ফোরণ এ যুক্ত। মালেগাঁও বিস্ফোরণে (২০০৬) তাঁরাই দায়ী। নাগোরির নির্দিষ্ট বক্তব্য ছিল — মালেগাঁও বিস্ফোরণে কিছু মুসলিম দুষ্কৃতীই যুক্ত ছিল এবং আমি তা জানতাম (**"In the Malegaon blast (2006), some of the muslim members were involved and I was aware of it."**)। সমঝোতা এক্সপ্রেসে-এ বিস্ফোরণ, মুম্বই-এর লোকাল ট্রেনে ধারাবাহিক বিস্ফোরণ, হায়দরাবাদ-এ (দোকানে) বিস্ফোরণ, আওরঙ্গাবাদ এবং আজমীর শরীফে বিস্ফোরণ-এর দায়ও স্বীকার করে নিয়েছেন নাগোরি। অথচ এদেশের বেশিরভাগ সংবাদমাধ্যম সেটাকে এড়িয়ে গিয়েছে। উঠে পড়ে লেগেছে হিন্দু সাধু-সন্ত, যোগী, সমাজসেবীদের সন্ত্রাসবাদী প্রতিপন্ন করার জন্য। এরই পরিপ্রেক্ষিতে যোগগুরু রামদেবজী প্রশ্ন তুলেছেন — যেসব রাজনৈতিক নেতাদের নামে ফৌজদারি মামলা ও অপরাধীদের সঙ্গে যোগাযোগের কথা উঠেছে তাদেরকে

সফদর নাগোরি

(এরপর ১৬ পাতায়)

এটিএস-মিডিয়ার অশুভ আঁতাত

ধৃত প্রজ্ঞা-পুরোহিত-উপাধ্যায়

গূঢ়পুরুষ ।। মালেগাঁও বিস্ফোরণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুম্বাইয়ে অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াড (এ টি এস) এখন মিডিয়াকে হাতিয়ার করে দেশ জুড়ে হিন্দু জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ করে জোরদার প্রচার চালাচ্ছে। একদা ঠিক এইভাবেই দক্ষিণের কাঞ্চীপীঠের শঙ্করাচার্যের বিরুদ্ধে হত্যা, নারী ধর্ষণ ইত্যাদি মারাত্মক অভিযোগ এনে দেশজুড়ে হিন্দুত্ব বিরোধী প্রচারে মিডিয়াকে ব্যবহার করা হয়েছিল। পরে দেখা যায় সব অভিযোগই মিথ্যা এবং পুলিশ ক্ষমা চেয়ে মামলা প্রত্যাহার করে। কিন্তু ততদিনে পূজ্য শঙ্করাচার্যের কারাবাস, লাঞ্ছনা সবই হয়ে গেছে। মিডিয়ার অপপ্রচারে তখন তামাম বিশ্ব জেনে গেছে যে হিন্দু ধর্মগুরুরা সবাই প্রতারক, ভণ্ড, ফ্রড। হিন্দুর মঠ মন্দির সবই আদতে অনাচারের আখড়া। মিডিয়ার সুবিধা হচ্ছে তার অপপ্রচারের দায়-দায়িত্ব নিতে হয় না, ধিকৃত হতে হয় না। অনেকেরই স্মরণে আছে যে দিল্লীর কাছেই উপনগরী নয়ডাতে রহস্যজনকভাবে একরাতে ডাঃ রাজেশ তলোয়ারের একমাত্র কিশোরী কন্যা খুন হয়ে যায়। খুনের তদন্তকারী গোয়েন্দা পুলিশ কন্যাকে হত্যার দায়ে তার বাবা ডাঃ তলোয়ারকে গ্রেফতার করে। মিডিয়াকে হাতিয়ার করে পুলিশ দিনের পর দিন প্রচার চালায় যে বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ যৌন সম্পর্ক মেয়ে জেনে যাওয়াতে ভীত ডাঃ তলোয়ার তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন। পরে আদালতে সাক্ষ্য প্রমাণ দূর অস্ত, আইনমত চার্জশীটই দিতে পারেনি পুলিশ। আদালত ডাঃ তলোয়ারকে মুক্তি দেয়। ততদিনে তাঁর প্রায় তিনমাস হাজতবাস

প্রজ্ঞা সিংহ ঠাকুর

শ্রীকান্ত পুরোহিত

রমেশ উপাধ্যায়

(এরপর ৪ পাতায়)

জাতীয় নদী হিসাবে সাংবিধানিক বৈধতা চাই গঙ্গার ঃ সিঙ্ঘল

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। গঙ্গাকে 'জাতীয় নদী' হিসাবে ঘোষণার সাংবিধানিক মান্যতা দেওয়ার জন্য কেন্দ্র সরকারকে সংসদে একটি বিল পেশ করতে অনুরোধ জানিয়েছেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সভাপতি অশোক সিঙ্ঘল। সম্প্রতি কেন্দ্র সরকার গঙ্গাকে 'জাতীয় নদী' এবং গঙ্গা সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখার জন্য 'গঙ্গা বেসিন অথরিটি' গঠন করেছেন। শ্রীসিঙ্ঘল বলেছেন, কেন্দ্র সরকারের এই ঘোষণা যতক্ষণ না পর্যন্ত সাংবিধানিক স্বীকৃতি পাচ্ছে, ততক্ষণ তা ঘোষণাই থেকে যাবে। গত ৫ নভেম্বর কেন্দ্র সরকারের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীসিঙ্ঘল এভাবে নিজের

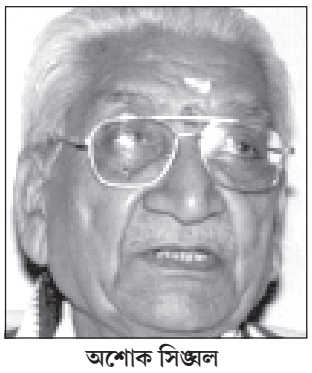

অশোক সিঙ্ঘল

প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।

শ্রীসিঙ্ঘল আরও বলেছেন, কোটি কোটি লোকের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের কেন্দ্র ভাগীরথী গঙ্গার প্রবাহ ও শুদ্ধতাকে উপেক্ষা করা হচ্ছে। আর একারণেই ক্ষুব্ধ পতঞ্জলি যোগপীঠ-এর প্রতিষ্ঠাতা স্বামী রামদেবজী। স্বামীজী গত ২৩ জুন 'গঙ্গা রক্ষা মঞ্চ' গঠন করেন। দেশের সমস্ত প্রমুখ সাধু সন্ত গঙ্গা রক্ষার এই পবিত্র কাজে অংশ নিয়েছেন। সম্প্রতি সারা দেশের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গে এই উদ্দেশ্যে সন্তযাত্রা গত ১৭ নভেম্বর শেষ হয়েছে। রঘুনাথগঞ্জে গঙ্গা পূজা ও আরতি হয়েছে। এছাড়া কাটোয়া, গঙ্গাসাগর ও কাঁথি থেকে শুরু হওয়া সন্ত-যাত্রাতেও এই ধরনের কার্যক্রম হয়। প্রতিটি কার্যক্রমেই গঙ্গার ধারাপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখা ও শুদ্ধতা বজায় রাখার দাবি জানানো হয়।

মালদাকে কেন্দ্র করে জাল নোট ছড়ানো হচ্ছে

মহাবীর প্রসাদ টোডি ।। মায়ানমারে বসে উত্তরবঙ্গ সহ গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতে জাল নোট ছড়িয়ে পুঁজি জোগাড় করছে উলফা। এমনই চাঞ্চ ল্যকর তথ্য পেয়েছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তর। সংগঠন চালানোর পাশাপাশি অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ এবং উলফা নেতাদের বিলাসবহুল জীবন যাপনের জন্য বিপুল পরিমাণ টাকা জোগাড় করতে, উলফা জাল নোটের কারবার শুরু করেছে বলে গোয়েন্দা সূত্রে খবর।

এতদিন পর্যন্ত পুলিশের কাছে তথ্য ছিল, বাংলাদেশ থেকে সীমান্ত পেরিয়ে উত্তরবঙ্গ সহ উত্তর-পূর্ব ভারতে জাল নোট ঢুকছে। গত এক মাসে উত্তর দিনাজপুর, মালদহ, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার পাঁচটি জায়গা থেকে বড় অঙ্কের জাল নোট আটক করেছে পুলিশ। ওই ঘটনায় জড়িত আটজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রেই জানা গিয়েছে, মালদহকে কেন্দ্র করে উত্তরবঙ্গে জাল নোটের কারবার চলছে। মূলতঃ বাংলাদেশ থেকে সীমান্তবর্তী এলাকার হাট-বাজারগুলিতে জাল নোট ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। গোয়েন্দাদের কাছে খবর যে, এক একটি প্যাকেটে অন্তত ১০ লক্ষ টাকার জাল নোট পাঠানো হচ্ছে। নোটের মান অনুযায়ী তার দাম ঠিক হয় বলে প্রকাশ। উলফার সঙ্গে এই নেটওয়ার্কে দিল্লীর এক ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে মালদহ, ডুয়ার্সের বীরপাড়া, ডিমডিমা, ও ফালাকাটার কয়েকজন ব্যক্তির নাম রয়েছে বলে প্রকাশ। উত্তরবঙ্গের পুলিশের আই জি কুন্দন লাল টামটা বলেন, বাংলাদেশ থেকে জাল নোট এ পারে পাচারের বিষয়টি তাদের জানা। তবে ইদানীং উলফা সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের কয়েকটি জঙ্গি সংগঠন জাল নোটের কারবারে যুক্ত হচ্ছে বলেও খবর আসছে।

কোথা থেকে এই নোট আসছে ও কারা তা ছড়াচ্ছে— এই দু'টি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে কয়েকটি টিম তৈরি করে নজরদারি বাড়ানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এদিকে জেলার তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, উত্তরবঙ্গ সহ গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতে জাল নোট ছড়ানোর প্রক্রিয়া অনেকদিন ধরেই চালানো হচ্ছে বিভিন্ন জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির মাধ্যমে। এইসব জঙ্গি সংগঠনগুলি পাকিস্তানের আই এস আই-এর দ্বারা বাংলাদেশে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। এবং উক্ত আই এস আই-এর পরিকল্পনা মতো জঙ্গি সংগঠনগুলি সুপরিকল্পিতভাবে ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোকে ভেঙ্গে দেওয়ার লক্ষ্যে এসব জাল নোট বিভিন্ন এজেন্টের মাধ্যমে, দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এ বিষয়ে সরকার অবিলম্বে কড়া পদক্ষেপ না নিলে অবস্থা আরও ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করতে পারে বলে ওয়াকিবহাল মহল মনে করছেন।

তিনশো কেরলীয় মুসলিম যুবক লস্কর-এ-তৈবা-য়

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। কেরালাতে বামশাসনে লস্কর-এ তৈবা তাদের ডালপালা বিস্তার লাভ করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। পুলিশের হাতে গত ২৭ অক্টোবর ধরা পড়েছিল লস্কর এজেন্ট ফয়জল। ফয়জল জেরার মুখে স্বীকার করেছে যে, সে একাই সম্প্রতি লস্কর এ তৈবার ফিদাইন বাহিনীতে কেরালার তিনশ-র বেশি যুবককে ভর্তি করেছে। ফয়জলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ আরও দুজন এজেন্টকে গ্রেপ্তার করেছে যারা ভর্তির দিনক্ষণ, যাতায়াত, টাকা-পয়সার হিসাব -রক্ষক ছিল। কাশ্মীরে সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে চারজন কেরলীয় মুসলিম যুবক মারা যাওয়ার পর পুলিশী তৎপরতা শুরু হয়। ধৃত এজেন্টরা কাশ্মীরে সঙ্ঘর্ষের ঘটনার পর তিরুর-এর বাড়ি পালিয়েছিল ।

রাষ্ট্রায়ত্ত তেল কোম্পানীগুলিকে ইউ পি এ সরকার ভিখারী বানিয়েছে

এন সি দে

প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল খনিজ তেল যাকে আদর করে মানুষ তরল সোনা বলে থাকে। মধ্য এশিয়ার বহু দেশ তো এই তেল বিক্রি করেই তাদের প্রাচুর্য্যের সাম্রাজ্যে বহাল তবিয়তে রাজা হয়ে বসে আছে। অথচ আমাদের তেল বিক্রির কোম্পানীগুলি আজ চরম আর্থিক সঙ্কটে ভিখারীতে পরিণত হয়েছে। ইউ পি এ সরকারের ভুল আর্থিক নীতিই এর জন্য দায়ী। অথবা এমনও হতে পারে লাভজনক সরকারি সংস্থাগুলিকে অলাভজনক করে তুলে ধীরে ধীরে বিলগ্নিকরণ করতে করতে একদিন কোনও বিদেশী সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্তের এটিএকটি অঙ্গ ।

কিছুদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল যে, রাষ্ট্রয়ত্ত তেল কোম্পানীগুলির আর্থিক ভাণ্ডার তলানিতে ঠেকেছে। এই আর্থিক দারিদ্র্য থেকে বাঁচাতে কেন্দ্রের মনমোহনের নেতৃত্বাধীন সরকার গত ১০ নভেম্বর, তিনটি তেল কোম্পানীর জন্য মোট ২২,০০০ কোটি টাকার স্পেশাল বন্ড ইস্যু করেছে। এর মধ্যে ইন্ডিয়ান অয়েল (আই ও সি) পাবে ১১,৯৭৬ কোটি, ভারত পেট্রোলিয়াম (বি পি সি এল) পাবে ৪,৬৯৪ কোটি। আর হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম (এইচ পি সি এল) পাবে ৫,৩৩১ কোটি টাকা।

অতীতেও অয়েল-বন্ড ইস্যু হয়েছে এবং সেগুলি নিয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়াও হয়েছে। এবারও তাই তেল কোম্পানীগুলি নিশ্চিত নয় যে, ব্যাঙ্কগুলি এই বণ্ড কিনে নেবে এবং কী দামেই বা নেবে। আগে তাদের এই বন্ড খুবই কম দামে বিক্রি করতে হয়েছিল। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষও তাদের দ্বিধাদ্বন্দ্ব গোপন করতে পারছেনা। কারণ সুদের বাজারে এখন চলছে চরম অস্থিরতা। বাজারের এই ভয়কে অর্থনীতির ভাষায় বলে Mark-To-Market (MTM)। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে এই ভয় তাড়া করছে যে যদি বন্ডের দাম তার নিজস্ব দাম (face value) থেকে কমে যায়, তাহলে ব্যাঙ্ককে বিশাল ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। অতীতে এই ক্ষতি হয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে প্রায় ১৯,০০০ কোটি টাকার বন্ড কিনে নিতে হয়েছিল।

এই বছরের শুরু থেকেই তেল কোম্পানীগুলি ঋণ করতে বাজারে নেমে পড়েছে উন্মাদের মতো। কোম্পানীগুলি বছরের প্রথম ছয় মাসেই ব্যাঙ্ক থেকে স্বল্পমেয়াদী ঋণ নিয়েছে ১৫,০০০ কোটি মতো। ২০০৪ সালে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকারের পতনের পর থেকেই তেল কোম্পানীগুলির এই হাল শুরু হয়েছে। ২০০৫ সালের এপ্রিল-সেপ্টেম্বর সময়কালে ব্যাঙ্কগুলির মোট ১,১১,০০০ কোটি টাকার ঋণের মধ্যে ১৫ শতাংশই নিয়েছে এই তেল কোম্পানীগুলি। এ বছরের ঋণের হিসাব সঠিকভাবে পাওয়া না গেলেও, এক ব্যাঙ্ক সূত্রে পাওয়া তথ্যে জানা গেছে যে এবারও তেল কোম্পানীগুলি ১৫ থেকে ২০ হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়ে ফেলেছে। এর মধ্যে IOC (ইণ্ডিয়ান অয়েল করপোরেশন) একাই নিয়েছেপ্রায় ৫০০০ কোটি টাকা এবং ২০০৫-০৬ থেকে এই ঋণ জমে জমে দাঁড়িয়েছে ২১,০০০ কোটি টাকায়। এছাড়া ঢখট্র ১০০০ কোটি টাকার দু'টি বন্ড ভাঙ্গিয়েছে এবং ৬৭০ মিলিয়ন ডলার বিদেশী ঋণও করেছে।

বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া তথ্য থেকে জানা গেছে, এন ডি এ সরকারের আমলেও এই তেল কোম্পানীগুলি প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৪০০০ কোটি টাকা মুনাফা করত (এটি কেবল বি পি সি এল এবং এইচ পি সি এল-এর মুনাফা)। এই দু'টি কোম্পানী থেকে সরকার তার শেয়ারের ডিভিডেণ্ড হিসেবেই বছরে পেত ৪০০ কোটি টাকা মতো। এটা প্রতি বছরই বেড়ে যাচ্ছিল। এক্সাইজ ডিউটি, কাস্টমস্ ডিউটি, সেল্স ট্যাক্স, ইনকাম ট্যাক্স প্রভৃতি খাতেও সরকারের ঘরে জমা পড়ত আগে ২৫,০০০ কোটি টাকা মতো। ভারতের পেট্রোলজাত দ্রব্যের বাজারের প্রায় ৪০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে বি পি সি এল এবং এইচ পি সি এল। আই ও সি নিয়ন্ত্রণ করে ৫০ শতাংশ। প্রথম দু'টি কোম্পানীর বাজারে পরিকাঠামো (Net Work) রয়েছে ১৫,০০০ কোটি টাকা মূল্যের।

বিজেপি চালিত এন ডি এ সরকার যখন এই তেল কোম্পানীগুলি বিক্রি করতে উদ্যোগী হয়েছিল, তখন এই কংগ্রেসী ও কমিউনিস্টরাই লাভজনক-অলাভজনক শিল্পের তত্ত্ব খাড়া করে, তেল কোম্পানী বিক্রি করার বিরোধিতা করেছিল। আজ কমিউনিস্ট মদতে গঠিত কেন্দ্রের কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকার তাই সত্য-সত্যই তেল কোম্পানীগুলোকে অলাভজনক পদ্ধতিতে রুগ্ন করে তোলার কাজে নেমেছে। গত ৪ বছরের মধ্যে এই কাজে তারা অনেকাংশেই সফল হয়েছে। ঋণ করে কোনও ব্যক্তি বা সংগঠনই বড় হতে পারে না। প্রথম দিকে ঋণ করে অভাব মেটাতে, পরের দিকে ঋণ করে ঋণ মেটাতে।

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যেমন প্রথমে একটি ক্রেডিট কার্ড নেয় অন্য ব্যাঙ্কের ক্রেডিট কার্ডের ঋণ মেটাতে। সর্বশেষ পরিণতি হয় আত্মহত্যায় মৃত্যু। তেল কোম্পানীগুলোও বিদেশী ঋণ নেওয়া শুরু করেছে দেশীয় ঋণ মেটাতে। শুধু অপেক্ষা পরিণতির খবরের জন্য।

আর এস এস-এর নতুন ওয়েবসাইট

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের একটি নতুন ওয়েবসাইট চালু হল। সম্প্রতি অন্ধ্রপ্রদেশের গুড়িলোভতে অনুষ্ঠিত অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডলের বৈঠকে ওয়েবসাইটির আনুষ্ঠাকি উদ্বোধন হয়। www.rssonnet.org নামে এই ওয়েবসাইটে সঙ্ঘের বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে সঙ্ঘের বিভিন্ন ছবি, তথ্যও এখান থেকে পাওয়া যাবে। পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীসুদর্শনজী-র বিজয়া দশমীর বৌদ্ধিকটিও ওয়েবসাইটে রাখা হয়েছে। সঙ্ঘের বিভিন্ন কার্যক্রমের বিশদ বিবরণও ওয়েবসাইট থেকে সবসময় পাওয়া যাবে। তবে প্রাথমিকভাবে এটিতে এখন শুধু ভারতের সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যাবে। ওয়েবসাইট থেকে শুভানুধ্যায়ীরা ক্লিক করলেই সঙ্ঘের বিভিন্ন দিক অনায়সেই জানতে পারবেন। ওয়েবসাইটটি চালু হওয়াই সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা স্বাভাবিকভাবেই খুশি। এর ফলে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের ঝুলিতে আরও ১টি নতুন ওয়েবসাইট যোগ হল।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুরের পর লালগড়

নন্দীগ্রাম সিঙ্গুর কান্ডের ঘটনার জের এখনও কাটে নাই। তাহার মধ্যেই আবার লালগড়কে সামনে রাখিয়া প্রায় তিন সপ্তাহ যাবৎ পশ্চিম মেদিনীপুরে জনজাতিদের আন্দোলন চলিতেছে। পুলিশি নির্যাতনের বিরুদ্ধে লালগড় আন্দোলনের সমর্থনে ঝাড়খণ্ড দিশম পার্টির ডাকা বন্‌ধকে কেন্দ্র করিয়া, এই আন্দোলন এখন পশ্চিম মেদিনীপুরের সীমা ছাড়াইয়া বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এমনকী হুগলিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বন্‌ধ, অবরোধ এবং বন্‌ধ-বিরোধী ও সমর্থকদের দফায় দফায় সংঘর্ষে জনজীবন একবারে বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। একদিকে সামাজিক বঞ্চ না ও অবহেলা, অন্যদিকে পুলিশি অত্যাচার — এই দুইয়ের জাঁতাকলে পিষ্ট হইয়া জনজাতি সমাজ আজ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়া যাওয়াতেই তাহারা প্রতিবাদে সোচ্চার হইয়াছে, রাস্তায় নামিয়াছে। গত কয়েক বছর ধরিয়া বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় মাওবাদীরা বেশ সক্রিয়। ইহার জেরেই কারণে-অকারণে নিরীহ জনজাতিদের পুলিশের হাতে হেনস্থা হইতে হইতেছে। ক্রমশ মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন সিপিএম-কে শাসন ক্ষমতায় জোর করিয়া টিকাইয়া রাখিতে পুলিশের মরিয়া চেষ্টার জন্যই লালগড় তথা জঙ্গল-মহলে জনজাতিদের এই জন-বিক্ষোভ। এইবার পঞ্চ ায়েত নির্বাচনেও পুলিশকে সামনে রাখিয়া সিপিএম ক্ষমতায় টিকিয়া থাকিতে মরিয়া চেষ্টা চালাইয়াছিল। নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করিতে সিপিএম সাধারণ খেটে খাওয়া জনজাতিদের মাওবাদী সাজাইয়াছে। শালবনীতে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় আক্রান্ত হইলে নিরীহ জনজাতি স্কুল ছাত্রদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। মহিলারাও রেহাই পাননি। জনজাতিদের এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করিতে নন্দীগ্রাম, কেশপুর ও গড়বেতার মতোই ক্যাডারদের হাতে অস্ত্র তুলিয়া দিয়াছেন সিপিএম নেতা-মন্ত্রীরা। মোটর বাইকে চাপিয়া সশস্ত্র মিছিল করিয়া মানুষকে তাহারা সন্ত্রস্ত করিয়া ফিরিতেছে।

গত দশ বৎসরে মাওবাদী সন্দেহে ধৃত নিরীহ গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার না করিলে কোনও মতেই আন্দোলন প্রত্যাহার করা হইবে না বলিয়া পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারণ কমিটির নেতারা স্পষ্টই জানাইয়া দিয়াছেন। বিভিন্ন গ্রামের 'মাঝি'দের সঙ্গে আলোচনা করিয়া প্রশাসনের কাছে তাহারা ইতিমধ্যেই ১১ দফা দাবিও পেশ করিয়াছেন। জনজাতি সংগঠনগুলির দাবি, এই আন্দোলনের পিছনে কোনও রাজনৈতিক দলের মদত নাই। সিপিএম অবশ্য বারবারই বলিবার চেষ্টা করিতেছে, আন্দোলনের পিছনে বিরোধী সব দলেরই উস্কানি রহিয়াছে। ঘটনা হইল যখনই রাজ্যে কোনও সমস্যা তৈরি হয় তখনই সিপিএম কোনও না কোনও অজুহাত খাড়া করিয়া থাকে। জঙ্গলমহলের আন্দোলন লইয়াও তাহারা তাহাই করিতেছে। একবার বলিতেছে, আন্দোলনকারীরা মাওবাদী। আবার পরক্ষণেই বলিতেছে, আন্দোলনকারীরা ভিন রাজ্যের লোক। আসলে জনসমর্থন হারাইয়া যাওয়ায় সিপিএম এখন পরস্পর বিরোধী কথা বলিতেছে।

জনজাতি আন্দোলন লইয়া এই 'বহিরাগত' তত্ত্ব প্রচারের আমদানির কারণ, সিপিএম খানিকটা রাজ্যের অন্যত্র 'জাগো বাংলা' জাতীয় পালটা আন্দোলনের কথা ভাবিতেছে। এই প্রচারে তাহারা তৃণমূলসহ রাজ্যের বিরোধী দলগুলির পাশাপাশি কেন্দ্রের ইউপিএ সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাইবার সিদ্ধান্ত লইয়াছে। এমনকী এই অভিযানে সিপিএম ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী শিবু সোরেনকেও ভিলেন হিসাবে চিহ্নিত করিতে চাহিতেছে। লালগড়ের আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাকে ভাগ করিবার চক্রান্ত হইতেছে — এই আবেগ জাগাইয়া রাজ্যের জনজাতি-বহির্ভূত সমাজের মধ্যে দলের গ্রহণযোগ্যতা ফেরানো যাইবে বলিয়া সিপিএমের নেতারা মনে করিতেছেন।

অন্যদিকে কেন্দ্রের ইউপিএ সরকার ফোর্স না পাঠানোয় সিপিএম নেতৃত্ব ও পুলিশ প্রশাসন চরম বিপাকে পড়িয়াছে। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো পুলিশ প্রশাসনের বড় কর্তাদের অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া লালগড়ে কর্মরত এক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের চাকরিই ছাড়িয়া দিয়াছেন। অথচ উচ্চশিক্ষিত, পুলিশ মহলে দক্ষ এবং সৎ হিসাবে তাঁর এগারো বছরের চাকরি জীবনে পরিচিত লাভ করিয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সামনে রাখিয়া জনজাতিদের আন্দোলন মোকাবিলার ছক ভেস্তে যাওয়ায় পরিস্থিতি সামাল দিবার পথ সিপিএম খুঁজিয়া পাইতেছে না। পশ্চিম মেদিনীপুরের ক্ষিপ্ত জনরোষকে সাংগঠনিকভাবে মোকাবিলা করিবার ক্ষমতা সিপিএম আগেই হারাইয়াছে। তারপর এই আন্দোলনের সময় যত বাড়িতেছে দলীয় কর্মী সমর্থকরা ততই বেশি করিয়া পুলিশ বিরোধী লড়াইয়ে সামিল হইতেছে।

বামফ্রন্টের শরিকদলগুলি, যেমন আর এস পি-ও মনে করে, বত্রিশ বছরের শাসনের পর জনজাতিদের বঞ্চনা ও অনুন্নয়ণের অভিযোগ তাহাদের লজ্জায় ফেলিয়া দিয়াছে। বামফ্রন্টের এইসব শরিক দলগুলি অবশ্য চরম সুবিধাবাদী। একই সঙ্গে গাছেরও খাইতে চায়, তলারও কুড়াইতে চায়।

সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, লালগড় — গত কয়েক বছর ধরিয়া একের পর এক ঘটনায় রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার ল্যাজে গোবরে হইতেছে। এই সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ তুঙ্গে উঠিয়াছে। পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ। রাজ্যের পাহাড় হইতে সমতল— সর্বত্রই নৈরাজ্যের ছায়া।

বৈশ্বিকরণ, আমেরিকার আর্থিক মন্দা এবং ভারত

ডঃ ভরত ঝুনঝুনওয়ালা

সারা পৃথিবী জুড়েই এ সময় আর্থিক মন্দা চলছে। এবং বেশ কিছুদিন তা অব্যাহত আছে। এই অবস্থায় দারুণ সংকটে পড়েছে আমেরিকার অর্থব্যবস্থা। অথচ এখন আর দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিশ্ব (রাশিয়া টুকরো টুকরো হওয়ার পর) অথবা ধ্রুবীকরণ-ই নেই। আমেরিকাই সর্বেসর্বা ছিল — আছেও। তবুও আমেরিকাতে একের পর এক কোম্পানী বন্ধ হচ্ছে, অনেক ব্যাঙ্ক নিজেদেরকে দেউলিয়া ঘোষণা করার কথা ভাবছে, কেউ কেউ করে দিয়েছে (যেমন, লেম্যান ব্রাদার্স)। এই মার বা আঘাত-এর কারণ হল বৈশ্বিকরণের হাওয়ায় গা-ভাসানো। বৈশ্বিকরণ-এর ফলে সারা পৃথিবীতে জুড়ে আর্থিক প্রতিযোগিতা বেড়েছে। আর এই বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার বাজারে যাদের উৎপাদিত পণ্যের মূল্য সস্তা এবং গুণমান ভালো হবে তারাই আন্তর্জাতিক বাজারে টিকে থাকবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে চীন ও ভারতে অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতেই একাজ করছে।

তবুও আমার মনে হয় ভারতীয় শেয়ার বাজারের উপর এই প্রভাব তৎকালিক। কিছুদিনের মধ্যেই ভারতীয় অর্থব্যবস্থা আমেরিকার সঙ্কটগ্রস্ততার ফলে লাভান্বিত হবে। এর প্রমুখ কারণ দু'টি। (এক) যখন আমেরিকার উপর চাপ বাড়বে তখন বৈশ্বিক পুঁজির স্রোত ভারতের দিকে আসবে। (দুই) ভারত বিশ্বের আর্থিক প্রতিযোগিতার ময়দানে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আমেরিকার ধাক্কায় যদি অন্যান্য উন্নয়ণশীল দেশের ৮০ ভাগ ক্ষতি হয় তবে সেক্ষেত্রে ভারতের ক্ষতির পরিমাণটা হবে মাত্র কুড়ি ভাগ। আমার আরও বিশ্বাস, এই বর্তমান অবস্থার ফলে বৈশ্বিক অর্থব্যবস্থার স্বরূপ বদল হবে এবং এক 'সংরক্ষণবাদ' (নিজেদের সুরক্ষিত রাখা)-এর উদয় হবে। কারণ, এবার

আমেরিকাতে একের পর এক কোম্পানী বন্ধ হচ্ছে, অনেক ব্যাঙ্ক নিজেদেরকে দেউলিয়া ঘোষণা করার কথা ভাবছে, কেউ কেউ করে দিয়েছে (যেমন, লেম্যান ব্রাদার্স)। এই মার বা আঘাত-এর কারণ হল বৈশ্বিকরণের হাওয়ায় গা-ভাসানো।

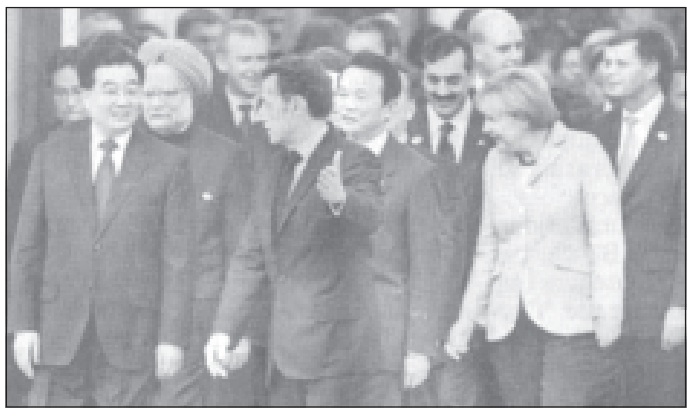

সম্প্রতি ওয়াশিংটনে জি-২০ গোষ্ঠীর রাষ্ট্রপ্রধানরা।

উৎপাদন খরচ কম পড়ে সেজন্য জিনিসপত্র সস্তা হয়। আমেরিকাতে যে কোনও জিনিসের উৎপাদন মূল্য অনেক বেশি লাগে। কারণ অমেরিকাতে শ্রমিকের মজুরী বেশি এবং কাঁচামালের দামও বেশি। এজন্য আন্তর্জাতিক বাজারে আমেরিকা মার খাচ্ছে। উল্টোদিকে ভারত এবং চীনের মতো উন্নয়নশীল দেশ এগিয়ে যাচ্ছে।

শুধু আমেরিকাই নয় সকল উন্নত দেশের আর্থিক জগতে আলোড়ন চলছে। সকলেই ভীত। আমেরিকাতে শ্রমিকের মজুরী কমছে। চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হচ্ছে। বিভিন্ন কোম্পানী লোন-এর কিস্তি জমা করতে পারছে না। এই সংকটের ছাপ ভারতের উপরও পড়েছে। এখানেও শেয়ার বাজারের সূচক ক্রমশই নীচে নামছে। এর প্রধান কারণ হল আমেরিকান বিনিয়োগকারীরা ভারতীয় শেয়ারবাজার থেকে নিজেদের লগ্নি তুলে নেওয়া। আমেরিকানরা তাদের দেশের সঙ্কটাপন্ন আমেরিকা এই মার খাওয়ার ফলে খোলা বাজার অর্থনীতি (Open market)-র উপর বেশি চাপ দেবে না এবং অন্যান্য দেশও অনুভব করবে যে, নিজেদের টিকে থাকার জন্য তাদের হাট করে খোলা দরজা-জানলা (Open Economy) বন্ধ করা প্রয়োজন। এখন ভারতে সেন্সেক্স ২১ হাজার থেকে কমে দশ হাজারেরও নীচে নেমেছে। ফলে শেয়ার বাজারে যারা বিনিয়োগ করেছিল তারা প্রতি এক টাকায় মাত্র ৪৫ পয়সা ফেরৎ পাবে। আগামী একবছর এই অবস্থা চলতে থাকবে। উন্নত দেশের লগ্নিকারীরা ভারতের শেয়ার বাজার থেকে তাদের টাকা-পয়সা তুলে নেবে। তবে তার মানে এই নয় যে, ভারতের অর্থব্যবস্থা চড়মড় করে ভেঙ্গে পড়বে। তিন-চার বছর আগে সেন্সেক্স ১৫-১৬ হাজারে ওঠা নামা করত। তা সত্ত্বেও আমাদের দেশের উন্নয়ণ ৮ শতাংশের উপরে ছিল। ওই অবস্থা আবারও আসবে। শেয়ার বাজারের সূচক পড়তে থাকলেও উন্নতির হার নিজের জায়গায় বহাল থাকবে। এজন্য ভারতীয় লগ্নিকারীদের ঘাবড়ানোর দরকার নেই।

এখন প্রশ্ন হল — এই মন্দা থেকে পরিত্রাণের উপায় কি? এজন্য দুটো রাস্তা আছে। প্রথম হল — ভারত সরকার জ্বালানি তেলে ভর্তুকী দেওয়া বন্ধ করুক। কারণ সাবসিডি দেওয়ার পুরো দায়টা সরকারের উপরে পড়ে, আর সেজন্য বিদেশী বিনিয়োগকারীরা এদেশ থেকে পালাবার পথ খোঁজে। ওই ভর্তুকী বন্ধ করা হলে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা খোলা মনে দরাজ হাতে এদেশে বিনিয়োগ করবে। তেলের দাম বাড়লে চাহিদা কমবে। এবং পরিবর্তে সরকার জনতার কল্যাণে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও দেশীয় উৎপাদনে সাবসিডি দিতে পারে। কাপড়, কাগজ, জুতো-চপ্পল, বাড়ি ভাড়া প্রভৃতিতে সাবসিডি দিলে তেলের কারণে দুরবস্থা কমবে এবং দ্রব্যমূল্য স্থির বা নিয়ন্ত্রিত হবে।

দ্বিতীয়ত, বাইরের ওঠা-নামা দেখে আমরা অন্তর্মুখী হয়ে নিজেদের কথা ভাবতে পারি। এর তাৎপর্য হল আমদানি-রপ্তানীর উপর জোর না দিয়ে দেশীয় বাজারের উন্নতির দিকে জোর দিতে হবে। কেউ জিজ্ঞাসা করতেই পারেন, বৈশ্বিকরণ এর যুগে অন্তর্মুখী হওয়া সম্ভব কী না! আমার মনে হয় অর্থব্যবস্থার বর্তমান টালমাটালের ফলে বৈশ্বিকরণ অস্তমিত হবে। কারণ বৈশ্বিকরণের ফলে উন্নত দেশগুলোর কোনও সুরাহার ব্যবস্থা হচ্ছে না। ওরা যত বেশি করে বৈশ্বিকরণকে গ্রহণ করবেন ততই ওদেরকে ভারতের মতো দেশের সস্তার জিনিস আমদানি করতে হবে। এজন্য আমার প্রস্তাব হল — "বৈশ্বিকরণ থেকে সম্পর্ক ছাড়, নিজের নিজের বাজারের চিন্তা কর।" এখানে উল্লেখ্য যে, টাটা কোম্পানী তাদের মোটর গাড়ি তৈরির কারখানা বন্ধ রাখছে। কর্মী সংকোচন বা ছাঁটাই করছে।

ভারতের অর্থনৈতিক উত্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পরে ১৯৪৪-এর জুলাই মাসে আমেরিকার নিউ হ্যাম্পশায়ারে মিত্রশক্তির ৪৪টি দেশের ৭৩০ জন প্রতিনিধি যখন বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর অর্থনীতি পুনর্নির্মাণের লক্ষ্যে আলোচনায় বসেছিলেন, তখন তারা কল্পনাও করতে পারেননি যে ভারত একদিন অর্থনীতির বিশ্বে মহাশক্তি হয়ে উঠতে পারে।

গত এক দশকের ঘটনা বলছে, সেই কল্পনার অতীত ঘটনাই সত্য হয়েছে। সম্প্রতি ওয়াশিংটনে জি-২০ জোটের বৈঠক হয়ে গেল, সেখানে স্থির হয়েছে যে বিশ্ব ব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (IMF)-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভারত ও চীনের মতো উন্নয়নশীল দেশের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হবে। একথা সত্য, বিষয়টি এখনও আলোচনার স্তরে, কিন্তু উন্নত দেশগুলি যে ভারতের মতো দেশের অর্থনৈতিক উত্থানকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে বাধ্য হচ্ছে, এ আলোচনা তারই প্রমাণ।

বিশ্বে অর্থনীতির ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের একাধিপত্যের দিন যে ফুরিয়েছে, এই সিদ্ধান্তই সেই পালাবদলের সূচক। বিশ্বের উন্নত দেশগুলির নেতারা একমত হয়েছেন, এই সংকট থেকে পরিত্রাণের প্রথম উপায় রাজস্ব বৃদ্ধি করা। উল্লেখ্য, ভারত ইতিমধ্যেই রাজস্ব খাতে ব্যয় বৃদ্ধির নীতি স্থির করেছে।

মনমোহন সিং ও জর্জ বুশ

এই সময়

ঘর বদল

ভগবান তৈরির কারখানা হিসাবে পরিচিত কুমোরটুলির ঘর বদল হবে বলে জানা গেছে। দীর্ঘদিন ধরে কুমোরটুলি অবহেলিত থাকলেও, অবশেষে বাম-নগরোন্নয়ন মন্ত্রীর বোধোদয় হয়েছে। তাদের কাশীপুরে নিয়ে যাওয়া হবে বলে মন্ত্রী জানিয়েছেন। কাশীপুরের মালগুদামগুলিকে কুমোরটুলির বাসিন্দাদের প্রাথমিকভাবে পুনর্বাসনের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। কুমোরটুলিবাসীদের উন্নত জীবনের উপহার দিতেই এই ব্যবস্থা। তবে এখানেও যে প্রমোটারি বা ক্যাডারগিরি চলবে না তা বলা যাচ্ছে না।

মহ্ঙ্গা কংগ্রেস

বিজেপি-র নির্বাচনী প্রচার স্লোগান ক্রমশই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। মোদীর জয়ের রূপকার অরুণ জেটলি এবার দলের জন্য, নতুন স্লোগান তৈরি করেছেন 'মহ্ঙ্গা হুয়ি কংগ্রেস'। স্লোগান তৈরির প্রেক্ষাপটও বেশ মজাদার। লোকের মুখে 'মহ্ঙ্গা হ্যায় শরাব' থেকেই দলীয় নেতাদের সঙ্গে বসে 'মহ্ঙ্গা হ্যায় কংগ্রেস' স্লোগান তৈরি করে ফেলেছেন রাজনীতিক অরুণ জেটলি। এমনিতেই তিনি দলের স্লোগান তৈরিতে মাহির।

ঘরে বিপদ

খোদ বর্ধমানেও বাংলাদেশী দুস্কৃতীদের বাড়-বাড়ন্ত নজরে এল। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ইতিমধ্যেই সতর্ক করে জানিয়েছে, এক শ্রেণীর দুস্কৃতী বর্ধমানকে কেন্দ্র করে, বাংলাদেশে ২ ও ৫ টাকার কয়েন পাচার করছে। এ ক্ষেত্রে কয়েনগুলি মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগণা হয়ে বাংলাদেশে ঢুকে পড়ছে। এদেশে ২-৫ টাকার কয়েনের মূল্য বাংলাদেশে বহুগুণ বেশি। ফলে দুস্থ বাংলাদেশীদের নজর এখন কয়েনগুলির প্রতি।

খাদ্যাভাবে পাক

পাকিস্তানের শহরে এখন ভিখিরির সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা মানুষের খাদ্য ভিক্ষার সংখ্যা বাড়ছে। করাচির সাবির হোটেলের ফুটপাত, জামিয়া কাপড় বাজার ও এম এ জিন্না রোডে দাঁড়িয়ে থাকা শত শত গরীব মানুষের হাহাকারই এই তথ্যের প্রমাণ। পাকিস্তানের অর্থনৈতিক মন্দা-র ফলে, এখন শহরে শহরে ভিখারির সংখ্যা বাড়ছে। চলতি বছরে ৫ শতাংশ গরীব বেড়েছে সে দেশে। মানুষের আয়ও কম। ৬৫.৫ শতাংশ মানুষ দিনে দু'ডলারেরও কম আয় করেন। বর্তমানে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা অনেকটাই মন্দা।

পূর্বাভাস

ওড়িশার কপালে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সংখ্যাটা অনান্য রাজ্যের থেকে তুলনামূলক বেশি। তবে স্টেট ডিজাস্টার মিটিগেশন অথরিটি এবার প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধ না করতে পারলেও, তার আগাম খবর মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে, একটি আধুনিক প্রযুক্তির মোবাইল হ্যান্ডসেট বের করেছে। সম্প্রতি এস ডি এম অথরিটি ও ন্যাশনাল রিমোট সেন্সিং-এর যৌথ উদ্যোগে পার্সোনাল ডিজিট্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স ডিভাইস নামে — এই মোবাইলে বিপর্যয়ের পূর্বাভাস থেকে ত্রাণশিবিরের খুঁটিনাটি তথ্য পাওয়া যাবে। হাত কম্পিউটারের মতোই গ্রাহকেরা এটি নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারবেন। তবে এটির দাম অবশ্য মধ্যবিত্ত-র ধরা ছোঁওয়ার বাইরে।

টয়লেটে ওবামা

ওবামার এখন একাদশে বৃহস্পতি। কখনও কালো বলে প্রশংসিত হচ্ছেন, কখনও বা অন্য কোনও কারণে তিনি খবরের শিরোনামে। সম্প্রতি খবরে প্রকাশ মিউনিখে একটি টয়লেট-প্যান দেখার জন্য ভুরি ভুরি লোক জমা হচ্ছে। প্যানটিতে ওবামার ছবি খোদাই রয়েছে।

বয়কট

কথায় বলে ঢাল নেই, তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার। বাংলাদেশের ন্যাশনালিস্ট পার্টির নেত্রী খালেদা জিয়া এখনই নিধিরাম সর্দারের মতো, যুদ্ধ করতে একেবারেই প্রস্তুত নন। কেননা তাঁর দলের বেশির ভাগ নেতা জেলে থাকায়, আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইছেন না। এই কারণে তিনি সাধারণ নির্বাচন বয়কটের ডাক দিতে চলেছেন। নির্বাচন বন্ধ হলে, তাঁর দলীয় লাভ হবে বলেও তাঁর আশা। তবে তিনি কতটা সফল হবেন তা নিয়ে কোনও মহলই মুখ খোলেনি।

লড়াই মুখি

মালেশিয়ার হিন্দুরা কিছুতেই সরকারের দমন-পীড়ন নীতির মুখে নতি স্বীকার করতে রাজি নয়। ইতিমধ্যেই সে দেশের হিন্দু রাইট অ্যাকশন ফোর্স জানিয়ে দিয়েছে, হিন্দুত্ব বিরোধী চক্রান্তর বিরুদ্ধে তারা লড়াই চালিয়ে যাবে। বৃহত্তর আন্দোলনে নামার কথাও তারা জানিয়েছে।

এ টি এস-মিডিয়ার অশুভ আঁতাত

(১ পাতার পর)

হয়ে গেছে। তাঁর সামাজিক সম্মান ভূলুণ্ঠিত। তাঁর চিকিৎসক পেশা বন্ধ। তবু ডাঃ তলোয়ার হার মানেননি। তিনি দিল্লীর মিডিয়ার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করেছেন। ডাঃ তলোয়ার মিডিয়ার জেনে বুঝে অপপ্রচারের মাধ্যমে চরিত্র হননের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে একাই রুখে দাঁড়িয়েছেন। এই সাহস এখন দেশের সমস্ত হিন্দুদেরই একযোগে দেখাতে হবে। যোগগুরু রামদেব মালেগাঁও কাণ্ডে গ্রেফতার হওয়া সাধবী প্রজ্ঞা সিংহ ঠাকুরের পরপর দু'বার নারকো টেস্ট করার কড়া সমালোচনা করে বলেছেন, হিন্দু বলেই মুম্বাই পুলিশ এমন অমানবিক আচরণ করার সাহস দেখাচ্ছে। সন্ত্রাসবাদী অভিযোগে ধৃত মুসলিমদের একজনকেও নারকো টেস্ট করা হয়েছে শোনা যায়নি। মালেগাঁও কাণ্ডে ধৃত হিন্দুদের বারংবার নারকো টেস্ট করানো হচ্ছে। কারণ মিডিয়াকে খাওয়ানো গল্পের সমর্থনে ধৃতরা বয়ান দিচ্ছেন না। মুম্বাই এ টি এস লাই ডিটেক্টার, নারকো টেস্ট, ব্রেন ম্যাপিং, আড়ং ধোলাই সব কিছুই করেছে। লাভ হয়নি। "হিন্দু সন্ত্রাসবাদ" মনগড়া গল্পই থেকে গেছে।

মালেগাঁও বিস্ফোরণ কাণ্ডে যুক্ত থাকার অভিযোগে মুম্বাই পুলিশ ২৩ অক্টোবর প্রথম দফায় প্রজ্ঞা সিংহ ঠাকুর, শিবনারায়ণ সিংহ, শ্যাম ভঁওরলাল সাহুকে গ্রেফতার করে। সাধবী প্রজ্ঞাদেবীর বিরুদ্ধে অভিযোগ যে বিস্ফোরণে ব্যবহার করা মোটরবাইকটি ছিল তাঁর। তদন্তে দেখা যায় যে বেশ কয়েক বছর আগেই তিনি তাঁর পুরানো বাইকটি বিক্রি করে দিয়েছিলেন। তারপর বাইকটি কতবার হাত বদল হয়েছে এবং সাধবীকে ফাঁসাতে কেউ সেই বাইকটিকে ব্যবহার করেছিল কিনা সে সব তথ্য পুলিশের অজানা। শিবনারায়ণ সিংহের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে মুম্বাই পুলিশ দুটি ইলেকট্রনিক রিমোট এবং একটি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করেছে। যে রিমোট দুটিকে দূর নিয়ন্ত্রিত বোমা ফাটানোর টাইমার বলে মিডিয়ায় গল্প ফাঁদা হয়েছে আসলে তা হচ্ছে টি ভি বা ভিডিও চালাতে লাগে বাজার চলতি রিমোট। শ্যামবাবুর পকেট থেকে একটি সেলফোন পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ বিস্ফোরণের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে এই সেলফোনের মাধ্যমে ষড়যন্ত্র রচনা করেছিলেন। কিন্তু এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত মুম্বাই এ টি এস আদালতে অভিযোগের সমর্থনে কোনও তথ্য দিতে পারেনি।

এরপর ২৮ অক্টোবর গ্রেফতার করা হয় সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর রমেশ উপাধ্যায় ও সমীর কুলকার্নিকে। অভিযোগ, মেজর উপাধ্যায় কীভাবে বিস্ফোরণ ঘটাতে হয় তারা তালিম দিয়েছিলেন। তাঁর বাড়ি থেকে মোবাইল ফোন, একটি পেনড্রাইভ ও তাঁর ব্যক্তিগত ডায়েরি বাজেয়াপ্ত করা হয়। ভাল কথা, বাজেয়াপ্ত ফোন, পেনড্রাইভ এবং ডায়েরি থেকে কী কী তথ্য পুলিশ পেয়েছে তা আজও আদালতকে জানানো হয় নি। কেন? সমীর কুলকার্নিকে গ্রেফতার করা হয়েছে কারণ তিনি মেজর উপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কুলকার্নির ব্যক্তিগত মোবাইল ফোনটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই ফোনের রেকর্ডে কী তথ্য পাওয়া গেছে মুম্বাই এ টি এস আদালতকে জানায়নি।

২রা নভেম্বর গ্রেফতার করা হয় অজয় একনাথ রহিরকার ও রাকেশ দওরাইকে। পুলিশের অভিযোগ, অজয়বাবু বিস্ফোরণ কাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হিন্দু সংগঠন অভিনব ভারতের কোষাধ্যক্ষ। অভিনব ভারত একটি সমাজসেবী সংগঠন। বীর সাভারকারের পরিবারের হিমানী সাভারকর এর প্রতিষ্ঠাতা প্রধানা। এই সংগঠন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে যুক্ত এমন কোনও তথ্য পুলিশ আদালতে পেশ করতে পারেনি। রমেশবাবু কাছ থেকে চার চারটে বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া গেছে। মুম্বাই পুলিশ এমনই দাবি করেছে। অথচ এইসব আগ্নেয়াস্ত্রের সঙ্গে মালেগাঁও বিস্ফোরণের যোগসূত্র কী তা আজও পুলিশ জানায়নি। বিনা লাইসেন্সে বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অভিযোগ ৩ নভেম্বর গ্রেফতার হন জগদীশ চিন্তামন মাত্রে। এ সম্পর্কেও কোনও তথ্য পুলিশ আদালতকে দেয়নি।

গত ৫ নভেম্বর গ্রেফতার করা হয় লেঃ কর্ণেল শ্রীকান্ত পুরোহিতকে। অভিযোগ করা হয়েছে যে পুরোহিত বিস্ফোরক আর ডি এক্স সরবরাহ করা থেকে "হিন্দু জঙ্গিদের" তালিম দেওয়া সবই নাকি করেছিলেন। এই আর্মি অফিসারই মালেগাঁও এবং ভারত পাকিস্তানের মধ্যে যাতায়াতকারী সমঝোতা এক্সপ্রেসের বিস্ফোরণ কাণ্ডের মূল পাণ্ডা। এ তো অভিযোগ। তথ্য প্রমাণ কই? সমঝোতা এক্সপ্রেস বিস্ফোরণে আর ডি এক্স ব্যবহার করা হয়নি বলে আগেই ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা সেইসময় লিখিতভাবেই আদালতকে জানিয়েছিল। অথচ মুম্বাই এ টি এস এখন দাবি করছে যে আর ডি এক্স ব্যবহার করা হয়েছিল এবং তা সরবরাহ করেছিলেন পুরোহিত।

আদালতে আজও এমন কোনও সাক্ষ্য প্রমাণ মুম্বাই পুলিশ উপস্থিত করেনি যাতে বোঝা যায় গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিরা আদতে সন্ত্রাসবাদী। তাতে কী হয়েছে? মিডিয়া তার বিচার শেষ করে রায় দিয়েছে হিন্দুরাও জেহাদি সন্ত্রাসবাদী। গ্রেফতার হওয়া সবাই অপরাধী। এদের ফাঁসি দাও।

আগরতলায় বিদ্যার্থী পরিষদের 'অনুপ্রবেশ সমস্যা' নিয়ে সেমিনার

সংবাদদাতা ।। গত ৮ নভেম্বর আগরতলায় স্থানীয় যক্ষা নিবারণী হলে 'অনুপ্রবেশ — একটি জাতীয় সমস্যা' — শীর্ষক এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রধান বক্তা বিদ্যার্থী পরিষদের ক্ষেত্রীয় সংগঠন সম্পাদক শ্যাম মোগা বলেন যে, বিনা যুদ্ধে ভারত দখল করার ইসলামিক রাষ্ট্রগঠনের অব্যাহত প্রক্রিয়ার নাম অনুপ্রবেশ। তিনি বলেন, যে বাংলাদেশ ভারতের সহায়তায় স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু আজ উত্তর-পূর্বাঞ্চ ল দখলের খেলায় নেমে বাংলাদেশ নিজেকে বেইমানের পরিচয় দিয়েছে। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে বিদ্যার্থী পরিষদের উত্তর-পূর্বাঞ্চ লের সহ-সভাপতি অধ্যাপক ডঃ রণজিৎ কিশোর ঠাকুর বলেন যে বর্তমান দেশের সন্ত্রাসবাদ ও অস্থিরতার জন্য দায়ী বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ। তাই বিদ্যার্থী পরিষদ অনুপ্রবেশ সমস্যাকে গুরুত্ব দিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চ লের সঙ্গে বাংলাদেশের ৪০৯৫ কিলোমিটার সীমান্ত সমীক্ষা করে সারা দেশে বিভিন্ন সভা-সমিতির মাধ্যমে জনচেতনা সৃষ্টি করেছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ত্রিপুরা সম্ভাগ প্রচারক মহেন্দ্র শর্মা বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চ লকে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত করার ষড়যন্ত্র চলছে। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে সভায় উপস্থিত ছিলেন পি টি আই-এর সংবাদদাতা জয়ন্ত ভট্টাচার্য, জমাতিয়া হদার মুখপাত্র তথা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রাজ্য কমিটির সদস্য রামপদ জমাতিয়া প্রমুখ। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ দুলাল চক্রবর্তী। সবশেষে ত্রিপুরা রাজ্য সভাপতি সুরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ সকলকে ধন্যবাদ জানান।

রাজ্য রাজনীতি

সি পি এম ব্যাপক জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন পরাজয় সুনিশ্চিত করা দরকার

নিশাকর সোম

তাপসী মালিককে নৃশংসভাবে পুড়িয়ে মারার পাশবিক হত্যাকাণ্ডের রায় বেরিয়েছে। সুহৃদ ও দেবু-র যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে। সংবাদপত্রে একটা কথা বেরিয়েছে যে, এটি রাজনৈতিক হত্যা নয়? যাই হোক, একজন কিশোরীকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। কত বড় পশুপ্রবৃত্তির মানুষ হলে তবেই এ ধরনের হত্যালীলায় মেতে উঠে। এই দু'জন শাস্তিপ্রাপ্ত হলেন সিপিএম-এর সদস্য। সিপিএম-এর এক নেতা — কুকথায় যিনি বাক্যবাগীশ, বিনয় কোঙার বলেছেন, "এটি ষড়যন্ত্র।" প্রতিটি শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের এই হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা এবং ক্রোধ প্রকাশ করা দরকার। সিপিএম যে আজ কত অধঃপতিত তাও এই ঘটনায় প্রকট হয়েছে। মহিলাকে ধর্ষণ করে পুড়িয়ে মারা হয়। যাতে আন্দোলনকারীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করা যায়। এর থেকে নির্মম আর কি হতে পারে?

আদালতের রায় বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে সিপিএম রাজ্য নেতৃত্বের একাংশ এটিকে ষড়যন্ত্র বললেও সিপিএম-এর হুগলী জেলা পার্টির মধ্যে এ নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। তা হল হুগলী জেলার পার্টি দুর্বল হল কেন? সিঙ্গুরের দায়িত্বে থাকা জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য কেন সঠিক রিপোর্ট জানাননি। উল্লেখ করা যায়, হুগলী জেলা পার্টির দুর্বলতা সম্পর্কে উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী সুদর্শন রায়চৌধুরী বহু পূর্বেই জানিয়েছিলেন বলে জানা গেছে।

এই রায় সম্পর্কে বামফ্রন্টের দুই নেতা তীব্রভাবে সিপিএম-এর নিন্দা করেছেন। সিপিআই নেতা-মন্ত্রী নন্দগোপাল ভট্টাচার্য বলেছেন — "আমাদের পার্টি হলে এদের তৎক্ষণাৎ পার্টি থেকে বহিষ্কার করতাম।" আর এস পি-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যা গীতা সেনগুপ্ত বলেছেন, "আইন নিজের পথে চলে অপরাধীদের শাস্তি দিয়েছে। মহিলা হত্যা সহ হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করতেই হবে।" উল্লেখ্য, ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা অশোক ঘোষ বহু পূর্বেই বলেছিলেন — "সিপিএম-এর নীচের তলার কর্মীদের অধিকাংশই লুম্পেন।" মনে রাখা দরকার আরও মামলা আছে — ছোট আঙারিয়ার সুকুর-এর মামলা, নন্দীগ্রাম মামলা, রিজওয়ান মামলা। এই মামলার প্রত্যেকটি সি বি আই চালাচ্ছে। এই সমস্ত মামলার ফলে সিপিএম-কে আরও ধিকৃত অবস্থায় পড়তে হবে। এই সমস্ত মিলিয়ে সাধারণ-মানুষের এক বড় অংশ সিপিএম বিরোধী হয়ে উঠেছে। এর প্রতিফলন হাওড়া পুর নির্বাচনে এবং পরবর্তী লোকসভা নির্বাচনেও পড়বেই।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রীত্বের ফলে দার্জিলিং-এ সিপিএম বহিষ্কৃত, প্রশাসন ব্যর্থ। দার্জিলিঙে সিপিএম প্রতিটি ভুল পদক্ষেপ নিয়েছে। তাদের নীতি — গোর্খা লিগ-কে কখনও কিক কখনও কিস। এ সমস্ত দ্বিচারিতার ফলেই আজ দার্জিলিং-এ এই অবস্থা। দার্জিলিং-এ পার্টি দেখার দায়িত্ব ছিল বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের। তিনি তার দায়িত্ব দিয়েছেন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্যকে। ফলে বিতর্কিত মন্ত্রী ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুভাষ চক্রবর্তী অশোক ভট্টাচার্য-এর প্রতিটি কাজের বিরোধিতা করে চলেছেন।

> **" বুদ্ধবাবুর ব্যর্থ নেতৃত্বের আর এক ফসল হল লালগড়। আজ শুধু লালগড় নয়, রাজ্যের সমগ্র আদিবাসী সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চলে মাওবাদীরা শক্ত ঘাঁটি গড়ে ফেলেছে। বস্তুত বুদ্ধবাবুর পুলিশ ব্যর্থ, প্রশাসনিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। একেবারে কংগ্রেস রাজত্বের শেষ পর্বে যা দেখা গেছলো আজ সিপিএম রাজ্যের শেষ পর্বে তা কি দেখা যাচ্ছে না? "**

সৌরভ গাঙ্গুলিকে বুদ্ধদেববাবু-অশোকবাবু সংবর্ধনা দিয়েছেন। তাই সুভাষ বাবুর কথা — কতবার একজনকে সংবর্ধনা দেবো? এদিকে মারাদোনাকে নিয়ে সুভাষ চক্রবর্তী সংবর্ধনার কাজে মেতেছেন। সুভাষবাবু বলেছেন "মুড়ি-মিছরি এক দর হবে না।" অর্থাৎ এখানে মুড়ি হল সৌরভ গাঙ্গুলি। সুভাষবাবু বাঙালির মর্মচেতনাকে এভাবে আঘাত করলে তিনি বিচ্ছিন্ন হবেনই। তিনি ইতিমধ্যেই পশ্চিমবাংলার ক্রীড়ামোদী তথা ক্রীড়া জগতের কাছে অস্পৃশ্য হয়ে আছেন। তাঁকে আর কেউই তেমন আমল দেন না।

সুভাষবাবু হলদিয়াতে গিয়ে আর এক নিন্দিত তথা বিতর্কিত নেতা লক্ষ্মণ শেঠ-এর সঙ্গে জোট বেঁধেছেন — যাতে বুদ্ধবাবু বিমানবাবুদের বিরুদ্ধে কামান দাগা যায়।

বুদ্ধবাবুর ব্যর্থ নেতৃত্বের আর এক ফসল হল লালগড়। আজ শুধু লালগড় নয়, রাজ্যের সমগ্র আদিবাসী সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চলে মাওবাদীরা শক্ত ঘাঁটি গড়ে ফেলেছে। বস্তুত বুদ্ধবাবুর পুলিশ ব্যর্থ, প্রশাসনিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। একেবারে কংগ্রেস রাজত্বের শেষ পর্বে যা দেখা গেছিল, আজ সিপিএম রাজ্যের শেষ পর্বে তা কি দেখা যাচ্ছে না?

বিমান বসু যতই নিচের তলায় কনভেনশন করে পার্টির দোষ বার করার চেষ্টা করুন না কেন — কমিউনিস্ট পার্টিকে উপরতলা থেকেই ঠিক করতে হয়। মাও লিউ শাই চি ডিমিট্রিভ স্তালিন এই নীতির কথাই বলেছিলেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি — এই কলামেই বহু আগে পার্টির সাংগঠনিক প্লেনামের কথা উল্লেখিত হয়েছিল। সেটি সঠিক বলে প্রমাণিত হল। তবে শুধু নিচের তলায় নয়, রাজ্য নেতৃত্বের বিরুদ্ধে নিচের তলায় বিস্ফোরণ হবেই। শুধু সময়ের অপেক্ষা।

সিপিএম রাজ্য নেতৃত্ব তাদের গণসংগঠনগুলিকে সক্রিয় করার জন্য সম্মেলন করাচ্ছেন। প্রধানত যুব সংগঠনকে সক্রিয় করার চেষ্টা হচ্ছে। যুব সম্মেলন উপলক্ষে যুব-পার্টি সদস্যদের মধ্যে পার্টির বর্তমান অবস্থার জন্য পার্টি নীতি নেতৃত্বকে দায়ী করে সমালোচনা উঠেছে — (১) শিল্প বনাম কৃষি (২) সরকার কেন স্থবির হয়ে থাকলো এবং (৩) টাটাদের চুক্তির মধ্যে কি আছে?

কৃষক সভার সম্মেলনে এই বিতর্ক উঠেছে — কৃষি বনাম শিল্পের এ অবস্থা হল কেন? টাটার চুক্তি পার্টির মধ্যে খোলাখুলি আলোচনা হয়েছিল কি?

সমগ্র কৃষকদের শিল্প বিরোধী তথা পার্টি বিরোধী করা হল কেন? সমগ্র গ্রামাঞ্চলে পার্টির ভাবমূর্তিকে ফেরানোর কথা কি নেতৃত্ব ভাবছেন? এইভাবে ব্যাপক বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে সিপিএম রাজ্য নেতৃত্বের কৃষক শ্রেণীর নীতি নিয়ে? কিছু কৃষক নেতার বিশেষ করে বিনয় কোঙার-এর বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা হয়েছে।

এদিকে সিপিএম-এর ছাত্র ফ্রন্টে বেসু এবং পি টি টি আই নিয়ে পার্টি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ উঠেছে। সাধারণ ছাত্রদের মনের অবস্থা তো পার্থ দে-এর গাড়িতে ইট মারার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে।

বর্তমানে সিপিএম ছাত্র-যুব-কৃষক - বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আগেই লিখেছিলাম, সিপিএম-এর অন্তর্জলি যাত্রা শুরু হয়ে গেছে। সিপিএম-এর গর্বাচভ হলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষক হলেন প্রকাশ কারাত এবং সীতারাম ইয়েচুরি। বৃদ্ধ সাজাহান জ্যোতি বসু মজা দেখে হাসছেন। পশ্চিমবাংলার জনগণ সিপিএম-কে নির্বাচনে পরাজিত করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

অ ঢ় রকম

জাদুকর

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। আগুন খেয়ে ফেলা কিংবা জ্বলন্ত কয়লার ওপর দিয়ে গড় গড় করে হেঁটে যাওয়ার মতো ঘটনা তাঁর কাছে শুধু স্বাভাবিক নয়, বলা যেতে পারে মামুলিবাত। সকলকে চমকে দেওয়ার মতো কান্ডটা তিনি শুধু রপ্ত নন, একেবারে করায়ত্ত করেছেন- হাতে কলমে। তবে তিনি কোনও বাবা উপাধি নিয়ে শিষ্য গোষ্ঠী তৈরির দিকে পা বাড়াননি। আবার 'পয়সা ফেকো, তামাসা দেখ' — এই নীতির ধারে কাছেও ঘেঁষেননি। অথচ আজব তাজব কাজে তিনি মাহি।

ঠান্ডা জলে ভাত রান্না করে উত্তরাখন্ডের মাঝবয়সী রাজপাল বাড়ির বৌ-বৌমা থেকে তাবড় তাবড় পাচকদেরও অবাক করে দিয়েছেন। আজকের দিনে ম্যাজিক দেখিয়ে ভুরি ভুরি রোজগার করাটা হয়ত অসম্ভব ছিল না, কিন্তু রাজপালের এই ছল— চাতুরীটা বিবেকে বাধে বলে, সেদিকে পা মাড়াননি।

তাছাড়া একদিন ভন্ড ম্যাজিসিয়ানদের কুকীর্তিই তো তাঁকে এই মিশন বাছতে বাধ্য করেছিল। তবে কী রাজপাল ঘরের খেয়ে বনের মোষ চরাচ্ছেন। রাজপাল অবশ্য একে এভাবে দেখতে রাজি নয়। তাঁর নিজের মতে, সাধারণ মানুষকে বোঝাতে হবে ম্যাজিক বলে তারা যে হই-হট্টগোল করছে, তা আদতে বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে জাদুকররা তাদের টুপি পরাচ্ছে। লোক ঠকানো এই ব্যবসার মুখোশ খুলতেই রাজপাল বড় বড় প্রদর্শনী, মেলা, সেমিনারে সাধারণ মানুষকে সজাগ করেন। ৭ থেকে ৭০ সকলের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন-ওই সব বুজরুকি ছাড়া অন্য কিছু নয়।

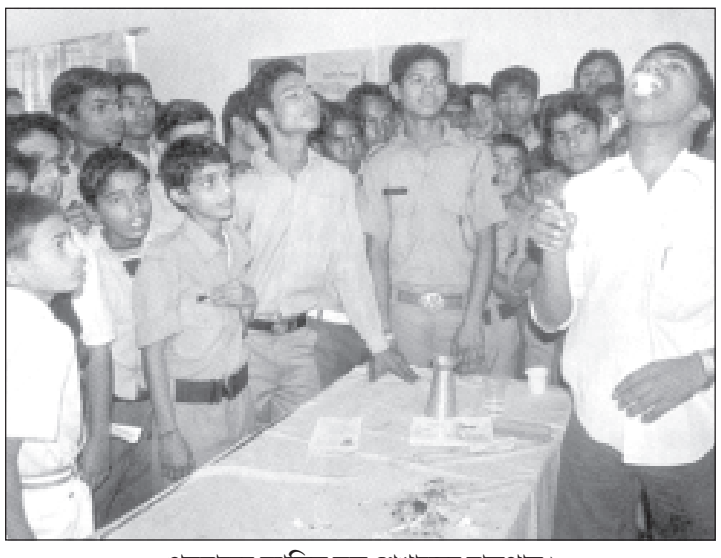

পড়ুয়াদের ম্যাজিক তত্ত্ব শেখাচ্ছেন রাজপাল।

কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চন্ধন্দ্বন্তুড় উত্তীর্ণ রাজপাল দিনের পর দিন প্রকাশ্য রাস্তা ঘাট আর টিভি-র পর্দায় বুজরুকির ব্যবসা দেখতে দেখতে প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন। আর সেই থেকে এই পথে চলা। তারপর থেকে একেবারে হাতে নাতে, বিচার বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা করে, রাজপাল দেখিয়ে দেন — ওই সব মিরাকেল আদতে কিছুই নয়। আগুন খেয়ে ফেলা কিংবা আগুনে হাঁটা — এই সবের পিছনে রয়েছে সূক্ষ্ম বিজ্ঞান। তাঁর মতে, একবিংশ শতাব্দীতেও কিছু অশিক্ষিত লোকের জন্যই জাদুকররা, ভন্ড সন্ন্যাসীরা তাদের ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারছে। রাজপালের মিশনটাই হল তাদের মাঝ রাস্তায় হাঁড়ি ভাঙা।

একাজে রাজপাল ব্যর্থ নয়। বরং জীবনে অনেকটা সফল। তাই তো সরকারি-বেসরকারি প্রদর্শনীতে রাজপাল ডাক পান। তাঁকে ডাকা হয় পড়ুয়াদের চোখ খোলার জন্য। আর এ কাজেই রাজপাল যেন নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছেন। পড়ুয়াদের বুঝিয়ে দেন ম্যাজিক-ম্যাজিক বলে তারা যা দেখছে তা তারা নিজেরাও ইচ্ছা করলে শিখতে পারে। বি-টেক-র পর টাকার লোভে সমাজ শোষণ না করে, উল্টে সমাজ থেকে শিক্ষা নিয়ে আজ তিনি সমাজকেই সুদে আসলে কিছু ফেরৎ দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

অনুপ্রবেশের ফলে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হচ্ছে ইসলামপুরে

মহাবীর প্রসাদ টোডি ।। উত্তরদিনাজপুর জেলার বাংলাদেশ লাগোয়া সীমান্তের অনেক জায়গায় কাঁটাতারের বেড়া না থাকায় অনুপ্রবেশ ও চোরাচালান ক্রমাগত বাড়ছে। ফলে জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে গোয়েন্দারা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। এই পরিস্থিতিতে বি এস এফের রায়গঞ্জ সেক্টরের সোনামতি এবং কিসানগঞ্জ সেক্টরের হাপতিয়াগছ সীমান্তে নজরদারি বাড়িয়ে

উত্তরবঙ্গে বেড়াবিহীন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত।

দেওয়া হয়েছে বলে প্রকাশ।

ইসলামপুর থানার সোনামতি সীমান্তে অনুপ্রবেশের ঘটনা সম্প্রতি অনেক বেড়ে গিয়েছে। গোয়েন্দাদের আশঙ্কা যে, অনুপ্রবেশের আড়ালে বাংলাদেশে ঘাঁটি গেড়ে থাকা জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির সদস্যদের ভারতে-ঢোকার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাছাড়া চোরা-চালানকারীদের মাধ্যমে এদেশে প্রচুর পরিমাণে জাল নোট ঢোকার বিষয়টিও গোয়েন্দারা খতিয়ে দেখছেন। উদ্বিগ্ন জেলা প্রশাসনও বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে। বি এস এফে-র তরফে সমস্যার কথা স্বীকার করে নেওয়া হলেও কড়া নজরদারি চলছে বলে দাবি করা হয়েছে।

সম্প্রতি জেলার সীমান্তে তৃতীয় দফায় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। সীমান্তের কিছু অংশে এই কাজ শেষ হলেও সোনামতি ও হাপতিয়াগছ সীমান্তের কয়েক কিলোমিটার এলাকায় এখনও বেড়া দেওয়া হয়নি। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে যে, প্রায় পাঁচ মাস ধরে সোনামতি সীমান্ত অনুপ্রবেশকারী ও চোরাচালানকারীদের নিশানা হয়ে উঠেছে। শুধুমাত্র গত এক মাসেই ওই সীমান্তে ১২ জন বাংলাদেশী ধরা পড়েছে এবং কয়েকশো গবাদি পশুও আটক করছে বি এস এফ জওয়ানরা। এছাড়া খোলা ওই সীমান্তে বি এস এফের গুলিতে ছয়জন অনুপ্রবেশকারীর মৃত্যু হয়েছে বলে প্রকাশ।

সম্প্রতি জেলা প্রশাসন সীমান্তে জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির সক্রিয়তা রুখতে পুলিশ বি এস এফ এবং প্রশাসনের আধিকারিকদের নিয়ে একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। বি এস এফ-র কিসানগঞ্জ সেক্টরের ডি আই জি চন্দ্রভূষণ বলেন, মহানন্দা নদীর জন্য এই সীমান্তের সর্বত্র বেড়া দেওয়া সম্ভব নয়। তবে কড়া পাহারা চলছে। আধুনিক দূরবীন দিয়ে রাতেও নজরদারি চলছে। তথ্যভিজ্ঞ মহলের মতে, জেলার সীমান্তবর্তী এলাকাকে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা ও চোরা-চালানকারীরা দীর্ঘদিন ধরে করিডর হিসাবে ব্যবহার করছে বললে হয়তো কোনও অত্যুক্তি হবে না। আর ভৌগোলিক সীমানার কারণে ও এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতাদের মদতে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা একদিকে যেমন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি অনুপ্রবেশের আড়ালে বাংলাদেশে ঘাঁটি গেড়ে থাকা জঙ্গিগোষ্ঠীগুলির সদস্যরা ভারতে ঢুকে নানা অপরাধ ও নাশকতামূলক কাজ-কর্ম করে গা ঢাকা দিচ্ছে। যদিও এ বিষয় সম্পর্কে প্রশাসনের উচ্চ-পদস্থ অফিসারেরা যে কিছুই জানেন না এমন নয়। কিন্তু প্রশাসনিক স্তরের নিস্ক্রিয়তা এবং রাজনৈতিক দলগুলির ভোট সর্বস্ব রাজনীতির জেরে এসব বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা খুব সহজেই পার পেয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাসকারী ভারতীয় হিন্দুরা কোণঠাসা হতে হতে সংখ্যালঘুতে পরিণত হচ্ছে। আর সীমান্তবর্তী এলাকায় সমস্যা দেখা দিয়েছে বাসস্থান নিয়েও। যার ফলে প্রকৃত ভারতীয়রা সীমান্তবর্তী এলাকাকে ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে। তাই একথা বলা যায় যে, অনুপ্রবেশ সমস্যা ক্রমে ক্রমেই এমন ভয়াবহ সমস্যার রূপ ধারণ করছে যে এর আসন্ন সর্বনাশ থেকে হয়তো কেউই রেহাই পাবেন না। তবুও কিন্তু সার্বিকভাবে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ নিয়ে বর্তমান সরকারের যে বিশেষ কোনও হেলদোল নেই তা মোটামুটি স্পষ্ট।

দেশবিরোধী চক্রের কাজকর্ম নিয়ে রাজ্য সরকার দায় এড়িয়ে যাচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা ।। অসমে বিস্ফোরণের পর উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি নিয়ে ছয় জেলার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব অমিত কিরণ দেব সম্প্রতি এক বৈঠকে বসেন। সেখানে উত্তরবঙ্গের জঙ্গি কার্যকলাপ, সীমান্ত পেরিয়ে জাল নোটের কারবার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। উত্তরবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে জঙ্গি কার্যকলাপের পিছনে অবৈধ মাদ্রাসাগুলির মদত রয়েছে বলে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা বারবার রিপোর্ট দিয়েছে। এমনকী উত্তরবঙ্গের সীমান্ত এলাকায় অবৈধ মাদ্রাসার তালিকাও রাজ্যের কাছে রয়েছে। এই ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে মুখ্যসচিব এড়িয়ে যান এবং বলেন, মাদ্রাসাগুলি সম্পর্কে এখনই কিছু বলা যাবে না। তবে সীমান্তে অনুপ্রবেশ, উত্তরবঙ্গে জাল নোটের কারবার নিয়ে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন। উত্তরবঙ্গে বাংলাদেশ সীমান্তের অনেকটাই খোলা থাকায় সেখান দিয়ে জাল নোট ঢুকছে এবং অনুপ্রবেশও হচ্ছে বলে তিনি স্বীকার করেন। মুখ্য সচিব রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তরের দুর্বলতা ও ব্যর্থতার কথা পরোক্ষভাবে স্বীকার করলেও এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে দায়সারা গোছের কথা বলে রাজ্য সরকারের দায়বদ্ধতার কথা এড়িয়ে গেছেন।

বোমা বিস্ফোরণের ফলে অসমে পর্যটকের সংখ্যা কমছে

সংবাদদাতা ।। বোমা-বিস্ফোরণের জেরে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পর্যটন শিল্প সব থেকে মার খেল। ভরা মরসুমে পর্যটকরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পাড়ি দিতে চাইছেন না। অসমে ভয়াবহ বিস্ফোরণের পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া সহ বহু বিদেশী রাষ্ট্র তাদের নাগরিকদের অসম ভ্রমণে আসতে বারণ করেছে। বিদেশী পর্যটকদের সতর্ক করে বলে দেওয়া হয়েছে, একান্ত প্রয়োজন ছাড়া তাঁরা যেন কোনও অবস্থাতেই অসমে পা না রাখেন।

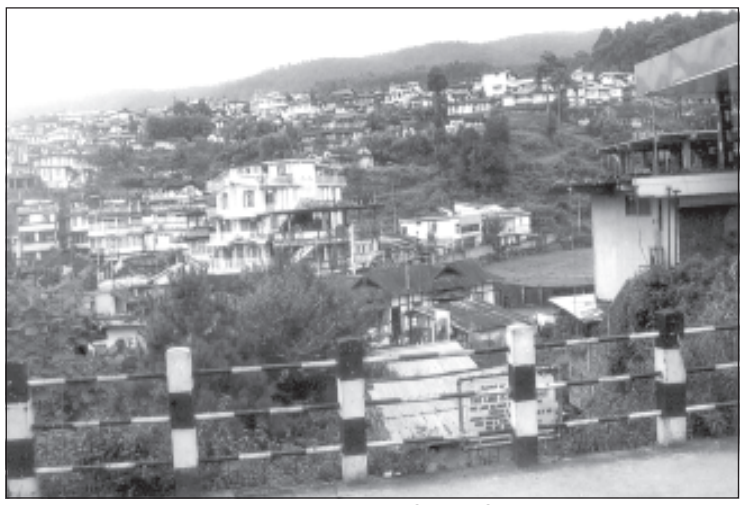

অসমের হাফলাং শহরের একটি নয়নাভিরাম দৃশ্য

বস্তুত বিদেশি পর্যটকদের নিরাপত্তার বিষয়টিকে মাথায় রেখেই এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকা সে দেশের নাগরিকদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, তাঁরা যেন কোনওভাবেই অসমে না-যান। আর যদি যেতেই হয়, তাহলে পর্যটকরা যেন নিজেদের নিরাপত্তার বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেন।

অসম ছাড়াও উত্তর-পূর্বের জঙ্গী কবলিত রাজ্য নাগাল্যাণ্ড, ত্রিপুরা ও মণিপুরের ক্ষেত্রেও রয়েছে একই নিষেধাজ্ঞা। এই রাজ্যগুলিতে জঙ্গি তাণ্ডব ছাড়াও বলপূর্বক টাকা আদায়, অপহরণ এবং সশস্ত্র লুঠপাটের মতো ঘটনা আকছার ঘটছে। পর্যটকদের প্রতি সরকারি নির্দেশে আরও বলা হয়েছে, অসম সহ ওই রাজ্যগুলি জঙ্গিদের মুক্ত বিচরণ ক্ষেত্র। পর্যটকরা এই অঞ্চলে ভ্রমণে এলে তারা যেন নিজেদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেন। তাছাড়া অঞ্চলের সর্বশেষ ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কেও খোঁজখবর রাখতে মিডিয়ার সাহায্য নেন।

কলকাতার মার্কিন কনস্যুলেট থেকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আমেরিকার কোনও সরকারি কর্মী কলকাতার মার্কিন কনস্যুলেট-এর অনুমতি ছাড়া অসমে যেতে পারবেন না। মার্কিন নাগরিকদের সতর্ক করে দিয়ে আরও বলা হয়েছে, অনিবার্য কারণে তারা যদি অসমে ভ্রমণে আসেন তাহলে যেন সর্বাবস্থায় ভিড় এড়িয়ে চলেন। জনবহুল স্থানে যেতে হলে বিশেষ সতর্কতা নেন। কোথাও পরিত্যক্ত ব্যাগ বা অন্য কিছু নজরে এলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা যেন প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

দেশে ফিরল ৫৫২ খৃস্টাব্দের বৌদ্ধ মূর্তি

হিন্দুস্থান সমাচার, কলকাতা।। আনুমানিক ৫৫২ খৃস্টাব্দে বৈশালী থেকে জাপানে পাড়ি দিয়েছিল ৩৮ সেন্টিমিটার দীর্ঘ বৌদ্ধ মূর্তি। কথিত আছে, অলৌকিক ক্ষমতা নিহিত আছে এই বৌদ্ধ মূর্তিতে। এতদিন জাপানের রেনকোজি মন্দিরে স্থায়ী ছিল এই আশ্চর্য বৌদ্ধ মূর্তিটি। অনুমান করা হয়, বুদ্ধ দেবের জীবদ্দশায় বৌদ্ধ মূর্তিটি নির্মিত হয়েছিল।

বুদ্ধ দেব ব্যক্তিগতভাবে মূর্তি নির্মাণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। জাপানে সম্রাট কেনমির শাসনকালে তিববতের পথ ধরে বৌদ্ধ মূর্তিটি পৌঁছায় সেদেশে বৌদ্ধ ধর্মবলম্বীদের উজ্জীবিত করতে। ভারতে এই বৌদ্ধ মূর্তি আগমনের কারণ হল রাজধানী দিল্লীতে জাতীয় সংগ্রহশালায় তিন সপ্তাহব্যাপী প্রায় ১৬০টি জাপানের বৌদ্ধ শিল্প প্রদর্শিত হবে।

'নির্মল গ্রামে'র সূচনা স্কুল থেকেই হতে পারে

সংবাদদাতা।। 'নির্মল গ্রাম পুরস্কার' প্রদান অনুষ্ঠান এবার হয়ে গেল অসমের গুয়াহাটিতে। ১৩টি রাজ্যের পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের হাতে নির্মল-গ্রাম পুরস্কার তুলে দেন শ্রীমতী প্রতিভা পাতিল। তিনি বলেছেন, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সুস্থ-স্বচ্ছ থাকার শিক্ষা প্রদান করতে পারলেই 'নির্মল গ্রাম'-এর স্বপ্ন সাকার হওয়া সম্ভব। তাঁর কথায় স্কুলই হতে পারে পয়ঃপ্রণালী অভিযানের বার্তা ছড়ানোর সূচনা কেন্দ্র। ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল থেকেই ওই বার্তা বয়ে আনবে বাড়িতে। এবং বাড়ি থেকে তা ছড়িয়ে পড়বে পুরো সমাজে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ভারতে মোট গ্রামের সংখ্যা কম বেশি সাড়ে ছ'লক্ষ। ২০০৩ সালে নির্মল গ্রাম পুরস্কার পেয়েছিল দেশের মাত্র ৪০টি গ্রাম পঞ্চায়েত। সারা দেশে সেই সংখ্যা এ বছর ১১ হাজার পার করেছে।

দেশের প্রতিটি পরিবার, স্কুল, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র সম্পূর্ণ পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থায় (Full Sanitation) আনার লক্ষ্যেই চালু করা হয়েছে নির্মল গ্রাম পুরস্কার।

এই উপলক্ষ্যে গুয়াহাটির কর্মবীর নবীনচন্দ্র বড়দলৈ ইনডোর স্টেডিয়ামে শ্রোতা-দর্শকদের উপস্থিতিতে উপছে পড়েছিল। তাই দেখে রাষ্ট্রপতির মন্তব্য ছিল — পয়ঃপ্রণালী অভিযান এখন সত্যিই জনগণের অভিযানে পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্রপতির মুখে ঘোষিত হল — 'মহাত্মা গান্ধীর স্বপ্ন-গ্রাম — ভারতের উন্নয়ন ছাড়া ভারতের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়।'

লেখকদের প্রতি

যে কোনওরকম লেখা, সে চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন তা কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন রেখে না হলে কোন মতেই ছাপার জন্য বিবেচিত হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না। কোনও লেখারই ফটো কপি গ্রাহ্য হবে না।

চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের ওপর "চিঠিপত্র" কথাটি অবশ্যই লিখবেন। এতে খুব তাড়াতাড়ি চিঠিটি একেবারে চিঠিপত্র বিভাগে গিয়ে পৌঁছায়।

চিঠিপত্র বা সংবাদ সামগ্রী যাই পাঠানো হোক না কেন তাতে প্রেরকের পুরো নাম-ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার (যদি থাকে) থাকা দরকার। না থাকলে তা ছাপা হবে না।

— সঃ স্বঃ

রমণ সিং চাউর (চাল) ওয়ালে বাবা বনাম গৃহী যোগীর লড়াই

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। ২০০৩ সালে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে ডাঃ রমণ সিং জনসমক্ষে বিশেষ পরিচিত ছিলেন না। আদর করে তাঁকে তাঁদের ভাষায় ডাকে 'চাউর ওয়ালে বাবা'। খাদ্য কর্মসূচীর এই একটি যোজনাই তাঁকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে নিয়ে দুনিয়া রমণময়'। এমনই কথা নির্বাচনের ঠিক প্রাক্ মুহূর্তে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার প্রতিবেদনে প্রচারিত হয়েছে। অথচ মানুষমারা, কর্তব্যরত

নির্বাচনী প্রচারে ভাষণরত ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী রমণ সিং।

তার একটা বড় কারণ ছত্তিশগড় রাজ্যে জনজাতিরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু ২০০৩ সালে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর তিনি এই হতদরিদ্র জনজাতি সমাজের কল্যাণে অন্তরের সবটুকু উজাড়ে করে যে কাজ করেছেন, তার লাভ এবারের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি দলের ঝুলিতেই ভরবে। পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য কংগ্রেস নেতা মানস ভুঁঞা একবার দু'টাকা কিলো চাল দেওয়ার কথা বলে কথা রাখতে পারেননি। এজন্য তাকে সিপিএম সমর্থকদের হাতে লঞ্ছিত হতে হয়েছিল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হয়ে প্রতিশ্রুতি মতো রমণ সিং- ৩ টাকা কিলো দরে চাল দিয়েছেন এবং যা এখনও চালু। সেজন্য জনজাতিরা গিয়েছে। সেজন্য রমণ সিং বিজেপি দলের বিশেষ মূল্যবান সম্পদরূপে চিহ্নিত হয়েছেন। তিনিই দলের তরফে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। এবারও দল তাঁকেই মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রজেক্ট করেছে। কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে তিনিও এবার বিজেপি-র স্টার ক্যাম্পেনার — নির্বাচনী প্রচারের মুখ্যচরিত্র। নকশাল প্রভাবিত বস্তার জেলাতে তিনি আদিবাসী জনজাতিদের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছেন খাদ্য-কর্মসূচীতে তিন টাকা কিলো চাল যোগান দিয়ে। অথচ পশ্চিমবঙ্গে তিন দশক ক্ষমতায় থেকেও বামপন্থীরা এরকম কাজ করা তো দূরের কথা, চিন্তা-ভাবনাও কখনও করেনি। 'ক্ষুধার' রাজ্য ছত্তিশগড়ের নিরাপত্তা রক্ষীদের নৃশংসভাবে হত্যা করা ছাড়া কোন্ জনদরদী, জনমুখী, জনকল্যাণকর কাজ মাওবাদীরা কবে কোথায় করেছেন? বস্তারের অরণ্যাঞ্চলে তো আদৌ নয়। সেই নকশালী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনজাতিদের নিয়েই 'সালওয়া জুডুম' গঠন করে সন্ত্রাসকে মোকাবিলা করে চলেছেন রমণ সিং। এব্যাপারে তিনি অন্যান্য দলকেও সঙ্গে নিয়েছেন। ২০০৩-এর নির্বাচনে প্রবল প্রতিপক্ষ কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী ও প্রাক্তন আই এ এস অফিসার অজিত যোগীর নেতৃত্বকে (ধর্মান্তরিত খৃস্টান) পরাস্ত করেই ক্ষমতায় এসেছিল বি জে পি।

ছত্তিশগড় রাজ্যে মোট আসন হল ৯০টি। সেখানে যোগীর গোষ্ঠীর কংগ্রেসীরাই বেশির ভাগ আসনে প্রার্থী। কংগ্রেস গতবারের মাত্র তিনজন প্রার্থীকে বদল করেছে। অপরদিকে বিজেপি প্রতিষ্ঠান বিরোধিতাকে (অ্যান্টি ইনকামবেন্সি) দূর করতে ৫৪ জন বর্তমান বিধায়কের আঠারোজনকেই বদল করেছে। যেরকমটা বিগত গুজরাট নির্বাচনে সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী করেছিলেন। এদিকে কংগ্রেসকে তাঁর কেন্দ্রের সহযোগী দল এন সি পি-কে তিনটি আসন ছাড়তে হয়েছে। টিকিট বন্টনে কংগ্রেসের আরও দুটি গোষ্ঠী থাবা বসিয়েছেন। মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন দুই মুখ্যমন্ত্রী, ভি সি শুক্লা এবং এ আই সি সি-র কোষাধ্যক্ষ মতিলাল ভোরা। ফলে কংগ্রেসকে তিনটি গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব সামাল দিতে হচ্ছে।

রাজপুত রমণ জনজাতিদের অন্তরে যে স্থান করে নিয়েছেন সেটাই বিজেপির প্লাস পয়েন্ট। সেই হিসেবে এবার রমণ সিং টেক্কা দেবেন অবশ্যই কংগ্রেসী স্টার ক্যাম্পেনারদের। ছত্তিশগড়ের এলাকাটা ধরলে ১৯৮০ সাল থেকে ২০০৩ পর্যন্ত কংগ্রেস ও বিজেপি-র ভোটের ফারাকটা

অজিত যোগী

একেবারে বদলে গিয়েছে, উল্টে গিয়েছে।

এবারের নির্বাচনে কোনও ইস্যুই আলাদাভাবে নেই, রয়েছে রমণ সিং বনাম অজিত যোগীর ব্যক্তিত্বের লড়াই। সামনের মাসেই জানা যাবে কার কায়া-ছায়া কাকে পরাজিত করল। যদিও এই লেখা যখন প্রকাশিত হবে তখন ছত্তিশগড়ে ভোট সমাপ্ত হয়ে গেছে।

ছত্তিশগড়ে কংগ্রেস ও বিজেপি দলের বিগত নির্বাচনী ফলাফল

	কংগ্রেস		বিজেপি	
বছর	প্রাপ্ত ভোট	প্রাপ্ত আসন	প্রাপ্ত ভোট	প্রাপ্ত আসন
১৯৮০	৫৩.৩ শতাংশ	৭৭	২৩.৪ শতাংশ	৬
১৯৮৫	৫১.৫ শতাংশ	৭৪	২৭.০ শতাংশ	১৩
১৯৯০	৩৫.৯ শতাংশ	২৩	৩২.৬ শতাংশ	৫১
১৯৯৩	৪০.৪ শতাংশ	৫৪	৩৫.৫ শতাংশ	৩০
১৯৯৮	৪০.৭ শতাংশ	৪৮	৪০.১ শতাংশ	৩৬
২০০৩	৩৬.৭ শতাংশ	৩৭	৩৯.৩ শতাংশ	৫০

চুঁচুড়ার আলোচনা সভায় বক্তার দিকে তেড়ে গেল মুসলিমরা

সংবাদদাতা ।। গত ২ নভেম্বর চুঁচুড়ার 'চৌবে লজে' একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে চুঁচুড়ার একটি সমাজসেবা মূলক প্রতিষ্ঠান 'সেবা'। আলোচ্য বিষয় ছিল মুদ্রাস্ফীতি, সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাসবাদ, সর্বধর্ম সমন্বয় এবং হিন্দু-মুসলমান ঐক্য। বিজেপি'র রাহুল সিন্‌হা, রানাপ্রতাপ রায় সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় কয়েকজন বক্তা বক্তব্য রাখার পর রানাপ্রতাপ রায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে কোরাণ থেকে সুরা এবং আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, হিন্দু মুসলিম ঐক্য অসম্ভব ব্যাপার। কোরানের নির্দেশই হচ্ছে অবিশ্বাসীদের ইসলাম কবুল করানো, অন্যথায় তাদের হত্যা করে তাদের স্ত্রী, কন্যা, ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করে নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নেওয়া। তিনি আরও বলেন, জেহাদ কি, জেহাদে অংশগ্রহণকারীদের বেহেস্ত এবং বেহেস্তের বর্ণনা।

আগুনে ঘি পড়ার মতো উপস্থিত মুসলিম শ্রোতারা রে রে করে তেড়ে এসে বলতে শুরু করে, কোরানের অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে, কোরানকে অপমান করা হয়েছে। এতে ইসলামের অবমাননা করা হয়েছে, বক্তাকে এজন্য ক্ষমা চাইতে হবে ইত্যাদি। বছর খানেক আগে হায়দরাবাদ প্রেস ক্লাবে তসলিমা নাসরিনকে একটি অনুষ্ঠানে যেভাবে আক্রান্ত হতে হয়েছিল, মৌলবাদী মুসলিমদের দ্বারা অনেকটা সেই রকমভাবে তর্জন গর্জন শুরু করে দেয় উপস্থিত মুসলমানরা।

তবে অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা যে রানাপ্রতাপ রায়কে শারীরিকভাবে আক্রান্ত হতে হয়নি। আশ্চর্যজনক বিষয় হল, হিন্দু প্রধান এলাকায় হিন্দুদের দ্বারা আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুসলমানরা এত সাহস পায় কোথা থেকে?

ক্যালকাটা ম্যাথেমেটিকাল সোসাইটি-র শতবর্ষ চলছে

আশিস গঙ্গোপাধ্যায় ।। আজ থেকে ঠিক একশো বছর আগে — ১৯০৮ সালের ৬ সেপ্টেম্বর শুধু ভারতবর্ষ নয়, এশিয়ার প্রাচীনতম এই বৈজ্ঞানিক সংস্থার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সিনেট হলে'। সেদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক কুলিস, অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দে এবং অধ্যাপক পি এল গাঙ্গুলি প্রমুখ খ্যাতিমান গণিতবিদরা। স্যার আশুতোষ নির্বাচিত হয়েছিলেন প্রথম প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং অধ্যাপক পি এল গাঙ্গুলী প্রথম প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। অন্যান্য দিক্‌পাল গণিতবিদরা প্রথম প্রতিষ্ঠাতা সহ সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

গত ৬ সেপ্টেম্বর উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পর সংস্থার বর্তমান সম্পাদক অধ্যাপক মহিম অধিকারীর বক্তব্য থেকে জানা যায়, তিনটি পর্যায়ে সংস্থার শতবার্ষিকী উদযাপন করা হবে। প্রথমটি উদযাপিত হয়েছে ২০০৮ সালের ৬ থেকে ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, একটি ন্যাশনাল সেমিনারের মাধ্যমে। পরেরটি হবে ২০০৮ সালের ১৯ থেকে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের মাধ্যমে এবং শেষ পর্যায়টি হবে একটি ওয়ার্কসপ ও সেমিনারের মাধ্যমে ২০০৯ সালে।

সম্পাদকের বক্তব্য থেকে আরও জানা যায় যে, সংস্থা বিশ্বের খ্যাতনামা গণিতবিদদের দ্বারা লিখিত নানা গণিতিক প্রবন্ধের ১০টি সংকলন প্রকাশ করবে যার প্রথমটি প্রকাশিত হয়েছে। গাণিতিক বক্তৃতা ছাড়াও প্রথম পর্যায়ের অনুষ্ঠানে আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় ছিল এ বছর রাজ্যের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিজ্ঞানে প্রথম স্থানাধিকারী বাঁকুড়ার গড় রায়পুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র কুমুদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুরস্কৃত করা।

প্রথম পর্যায়ের অনুষ্ঠানের শেষ দিনে অর্থাৎ ৮ সেপ্টেম্বর ছিল একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে দুটি বিভাগে গাণিতিক আলোচনার প্রতিযোগিতা হয়। যেটি তাদের মেধা এবং উপস্থাপনার গুণে হয়ে উঠেছিল খুবই আকর্ষণীয়।

স্বামী লক্ষ্মণানন্দ সরস্বতীর হত্যাকারীদের শাস্তির দাবিতে সভা

সংবাদদাতা ।। গত ২৩ আগস্ট ওড়িশার কন্ধমালে খৃস্টান দুস্কৃতীদের হাতে নির্মমভাবে খুন হন স্বামী লক্ষ্মণানন্দ সরস্বতী মহারাজ। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মার্গদর্শক হিসাবে ও ওড়িশার জনজাতি ক্ষেত্রে বিশেষভাবে শ্রদ্ধেয় ছিলেন তিনি। লক্ষ্মণানন্দজীর স্মরণে ও দোষীদের গ্রেপ্তার এবং শাস্তির দাবিতে সারা দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি সভা ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গত ৭ নভেম্বর মেদিনীপুরের ক্যালেক্টরেট গেটের সামনে লক্ষ্মণানন্দজীর স্মরণ সভা ও প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্থানীয় কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবকরা। বক্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণ বঙ্গের প্রান্ত কার্যবাহ তিলক রঞ্জন বেরা, স্বপন ঘোষ, সোমনাথ সিংহ, প্রদ্যোৎ সাউ, অমর দে প্রমুখ। দোষীদের শাস্তির দাবিতে অতিরিক্ত জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপিও জমা দেন তাঁরা।

এদিনই উত্তর ২৪ পরগণার হাজিনগরে সঙ্ঘ ও সমমনোভাবসম্পন্ন সংগঠনগুলির উদ্যোগে স্বামী লক্ষ্মণানন্দজীর শ্রদ্ধাঞ্জলি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন সঙ্ঘের সহ প্রান্ত কার্যবাহ প্রদ্যোৎ মৈত্র, কাজল শিকদার, উমাশংকর সিং, বি এন সিং, কিশোর কর প্রমুখ। বক্তারা সকলেই হত্যাকারী এবং ষড়যন্ত্রকারীদের শাস্তির দাবি জানান।

জগদীশ চন্দ্র বসু সার্ধ-শতবর্ষে একটি সমীক্ষা

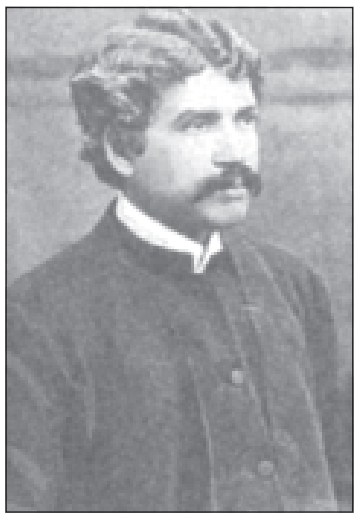

দেবীপ্রসাদ রায়

“দেশ দেশান্তরের মনীষীগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করেছেন, আজও প্যারীতে (প্যারিস), মহা কেন্দ্রের ভেরীধবনি, যাঁর নাম উচ্চারণ করিবে, সে নাদ তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্বজন সমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। আর আমাদের জন্মভূমি — এ জার্মান, ফরাসী, ইংরেজ, ইতালী প্রভৃতি বুধ মন্ডলীমন্ডিত মহারাজধানীতে তুমি কোথায় বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয় ? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহু গৌরবর্ণ প্রতিভামন্ডলীর মধ্য হতে এক যুবা যশস্বী বীর, বঙ্গভূমির — আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করিলেন — সে বীর জগৎ প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডঃ জে সি বোস। এক যুবা বাঙালী বৈদ্যুতিক, আজ বিদ্যুৎবেগে পাশ্চাত্য মন্ডলীকে নিজের প্রতিভায় মুগ্ধ করিলেন — সে বিদ্যুৎ সঞ্চার মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবন তরঙ্গ সঞ্চার করল, সমগ্র বৈদ্যুতিক মন্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ জগদীশ চন্দ্র বসু ভারতবাসী” — এ ভাবেই বর্ণনা করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ প্যারিসে উপস্থিত থাকাকালীন। ভারতে নবজাগরণের যে উন্মেষ ঘটিয়ে ছিলেন রাজা রামমোহন রায় বিদ্যাসাগর প্রমুখ মুষ্টিমেয় কয়েকটি মানুষ তার ফসল যে পত্রে পুষ্পে ঝলমল করতে শুরু করেছিল বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতে, সার্ধ শতবর্ষ আগে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর আবির্ভাব (১৮৫৮) তারই একটি উজ্জ্বল প্রত্যক্ষ প্রমাণ। জগদীশ চন্দ্র বসুর আবিষ্কারে আভাসিত হয়েছিল এক নতুন জগত — বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়েছিল অহংকারী পাশ্চাত্য জগৎ। ইউরোপের দুই শ্রেষ্ঠ লেখক রোমা রঁলা এবং বার্নাড'শ নিজেদের গ্রন্থ জগদীশ বসুকে উপহার দিয়ে সম্মানিত করেন। রঁলা তাঁর ‘জাঁ ক্রিশতত্ব’ বই-এর পৃষ্ঠায় লিখে দিয়েছিলেন “নতুন একটি পৃথিবীর আবিষ্কারককে এই গ্রন্থ উপহার দিলাম।”

আজ সার্ধ শতবর্ষ পরে বিচার করে দেখলে মনে হয় কী অসাধ্য সাধনই তিনি করেছিলেন অনায়াসে। ইংল্যাণ্ডে উচ্চশিক্ষার জন্য এসে বিজ্ঞানে ‘স্টাইপেণ্ড’ লাভ করেন ১৮৮৪ সালে এবং তারপর লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি এস সি ডিগ্রী অর্জন করার পর দেশে ফিরে প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনায় যোগ দেন। অনেক প্রতিকূলতার সাথে যুদ্ধ করতে করতেও পাশ্চাত্য জগতে বিজ্ঞানের যুগান্তকারী আবিষ্কারগুলির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন শ্রীবসু। ১৮৬৫ সালে ম্যাক্সওয়েল তড়িৎ ক্ষেত্র এবং চৌম্বিক ক্ষেত্রের মধ্যে থাকা অপরিহার্য সম্পর্ক সম্পর্কিত তাৎপর্যমন্ডিত সমীকরণগুলি আবিষ্কার করেন। ম্যাক্সওয়েল সমীকরণ নামে চিহ্নিত এই সমীকরণগুলি ইঙ্গিত দিল তড়িৎ ক্ষেত্র বা চৌম্বিক ক্ষেত্র যারই তীব্রতার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটুক না কেন, এক তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ উৎপন্ন হয়ে আলোর গতিতে গতিশীল হয় শূন্য মাধ্যমে। ১৮৮৮ সালে বৈজ্ঞানিক হার্টজ ছণ্ড্রন্দ্বক্তজদ্ধন্ত্রগ্ন তার বাস্তবতা প্রমাণ করলেন। অনেক অনেক দূরে ভারতবর্ষে কলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজ অধ্যাপনারত জগদীশচন্দ্র বসু তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ উৎপাদনে অগ্রসর হলেন। দেশীয় সাধারণ এক মিস্ত্রীকে দিয়ে তিনি তৈরি করে ফেললেন ‘স্পার্ক’ উৎপাদন যন্ত্র। সেটিকে এক টিনের বাক্সে রেখে বাক্সের সামনে এক ছিদ্রমুখে লাগালেন একটি গোলমুখ নল যা থেকে বেরিয়ে আসবে তার সৃষ্ট তরঙ্গ। স্পার্ক উৎপাদনকারী তড়িৎদ্বারগুলির মধ্যে প্রয়োজনীয় বিভব বৈষম্য তৈরি করতে কাজে লাগালেন তাঁরই দ্বারা পরিমার্জিত এক রুমকর্ফ আবেশকুন্ডলীকে। আবেশ কুন্ডলীকে সক্রিয় করতেই নলমুখ দিয়ে বেরিয়ে এল অদৃশ্য তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ। সবার সামনে সৃষ্ট তরঙ্গের বাস্তবতা জানান দিতে, ১৮৯৫ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজের ল্যাবরেটরিতে যে পরীক্ষাটি তিনি করলেন, তাতে তাঁর উদ্ভাবিত অতিস্বল্প দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ একটি ঘর ভেদ করে, অন্য ঘরে গিয়ে একটি পিস্তলকে দিয়ে গুলি ছোঁড়াল। ‘রিমোট’ বলে যে কথাটি এখন বহুল প্রচলিত এক অর্থে তার শুরু হয়েছিল এই পরীক্ষা থেকেই। কিছুদিন পরেই বাংলার তৎকালীন লেঃ গভর্ণর ডব্লিউ ম্যাকেঞ্জির উপস্থিতিতে এই পরীক্ষাটি প্রদর্শিত হল। এই ছোট্ট অথচ যুগান্তকারী পরীক্ষাটির তাৎপর্য সম্যক উপলব্ধ না হলেও বিদ্যোৎসাহী মহলে একটি আলোড়ন উঠলো। ‘ইন্ডিয়ান মিরর’ এবং ‘ডেলি টেলিগ্রাফ’ তাদের প্রতিবেদন প্রকাশ করল। কিছুদিনের মধ্যেই এস আর বোটন প্রকাশিত পুস্তক ‘নক্তন্দ্বপ্তন্দ্বব্দব্দ বন্দ্বপ্তন্দ্বব্দ্ধ্রমড়স্তুস্ত ড্রন্দ্বক্তজদ্ধন্ত্রন্দ্ব’-এ এই সম্পর্কিত রিপোর্ট স্থান পেল। এই প্রাথমিক সাফল্য শ্রীবসুকে গবেষণার এক নতুন জগতের দ্বার প্রান্তে নিয়ে এল। পরবর্তীকালে ঊন আশিটি গবেষণাপত্র এবং চৌদ্দটি পুস্তক এরই ফলশ্রুতি। ১৮৯৫ সালে মে মাসে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল পত্রিকায়। প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল ‘বড়ন্দ্ব ত্নপ্সস্ত্রক্তজনব্ধব্দনপ্সং প্সন্দ্র ড্রপ্তন্দ্বন্তব্ধক্তজনন্ত স্থ্রভস্থ্রট্রক্তজন্তন্দব্ধপ্তব্দ’ বোঝাই যাচ্ছে ড্রপ্তন্দ্বন্তব্ধক্তজনন্দ্ব স্থ্রভ বা তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ নিয়ে ওই স্বল্প সময়েই তিনি তাঁর গবেষণায় দ্রুত অগ্রসর হয়েছিলেন। ১৮৯৬ সালে তাঁর পরীক্ষাগুলি দেখানোর জন্য তিনি ইউরোপ গেলেন। ২১ সেপ্টেম্বর গ্লাসগো বৃটিশ এস্যোসিয়েশনে তিনি তাঁর পরীক্ষাগুলি দেখালেন, লর্ড কেলভিন শ্রীবসুর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন এবং লর্ড র‍্যালে সপ্রশংস মন্তব্যে বললেন যে, এমন ত্রুটিহীন পরীক্ষা প্রদর্শনী ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। বিভিন্ন পরীক্ষায় ব্যবহারের জন্য তিনি যে প্রেরক যন্ত্র তৈরী করেছিল (তাঁর ভাষায় স্থ্রস্তুন্ত্রব্ধনঃব্ধচপ্সপ্রগ্ন তা অত্যাশ্চর্যজনক ভাবে ক্ষুদ্র অথচ অভ্রান্ত ছিল। একটি প্রেরক যন্ত্র ছিল ৭ক্সক্স ৬ক্সক্স ৬ক্সক্স মাপের-তার চেয়েও ছোট যন্ত্র তিনি তৈরি করেছিলেন। তাঁর যন্ত্রে ব্যবহৃত শক্তি বিকিরণী নলকে এখন মাইক্রোওয়েভ বিজ্ঞানীরা বিশ্বের প্রথম “শ্লন্দ্বক্ত ত্তপ্সস্তুন্দ্বপ্তন্দ্ব গুব্ভনস্তুন্দ্ব” বলে স্বীকার করেছেন ‘ট্রপ্সপ্তপ্তন্দ্বন্তব্ধনঃব্ধ ঠব্জঃন্দ্বপ্ত” বলে যে, চোঙটি বসু ব্যবহার করেছিলন তাকেই এখন ‘ড্রপ্সক্তঃ টুন্দ্বক্তজন্ত্রপ্ত’ বা ‘ড্রপ্সক্তঃ টুব্ধন্দ্ধ’ বলা হয়। এটি এখনো সারা বিশ্বে ত্তনন্তক্তজপ্স-ত্তনপ্তপ্তনপ্লন্দ্বব্ধন্দ্বক্ত চব্ধন্দ্বক্তঃন্দ্বব্ধ ব্যবস্থায় র‍্যাডারে এমনকী উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থাতেও ব্যবহৃত হচ্ছে। এখন দেখা যাক, জগদীশ বসু স্বল্পদৈর্ঘ্য তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ ধরতে কি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। উৎস স্থল থেকে দূরে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গকে ধরাই বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ সোপান। শ্রীবসু এই তরঙ্গ ধরার ব্যবস্থা হিসেবে যে গ্রাহক যন্ত্র তৈরী করলেন তাকে বলা হত, সেই সময়, কোহেরার ছট্রপ্সড়ন্দ্বক্তব্ধক্তজগ্ন। দুটি তরঙ্গের দশাগত তালমিল সম্পর্কিত অবস্থাকে ন্তপ্সড়ন্দ্বক্তজন্দ্ধব্ধ অবস্থা বলা হয় — এ থেকেই ‘ট্রপ্সড়ন্দ্বক্তব্ধক্ত’ কথাটি এসেছিল। অলিভার লজ তাঁর পরীক্ষায় লোহা ও তামার গুঁড়ি থাকা কয়েকটি বাক্স ও ব্যাটারী ব্যবহার করেছিলেন। বিদ্যুৎ-স্পার্ক বা স্ফুলিঙ্গ থেকে উদ্ভূত তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের প্রভাবে ধাতব সংস্পর্শের বা ধাতবগুঁড়ির রোধের পরিবর্তন হয় এবং তার ফলে বর্তনীতে তড়িৎ প্রবাহের পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তণ তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের উপস্থিতি ঘোষণা করে। এই উপস্থিতি ঘোষনাই কোহেরারের কাজ। এটি কিন্তু একাটানা কাজ করতে পারছিল না। ফলে নিশ্চিত ভাবে প্রেরিত তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গকে ধরা যাচ্ছে — সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করা যাচ্ছিল না। জগদীশ চন্দ্র বসু ধাতব গুঁড়ির পরিবর্তে লোহার ছোট ছোট স্প্রিং ব্যবহার করলেন। ইবোনাইটের টুকরোর উপর চৌকো একটা গর্ত কেটে সেই গর্তে তিনি এক সারি লোহার স্প্রিং (২ মি.মি ব্যাস, ১ সেমি. লম্বা) বসালেন। এবারে তার উপর তরঙ্গ আছড়ে পড়তেই সংশ্লিষ্ট গ্যালিভ্যানোমিটার ব্যবস্থার দ্রুত বিক্ষেপ দেখা দিয়ে তরঙ্গ তার উপস্থিতি ঘোষণা করল। আরো উন্নত কোহেরার উৎপন্ন করতে শ্রীবসু পর্যায় সারণীতে যতগুলি মৌলিক পদার্থ আছে তার প্রায় সবগুলি নিয়েই কোহেরার তৈরীর চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর গবেষণাপত্র “প্সন্দ্র ব্দন্দ্বপ্তন্দ্র ক্তজন্দ্ব-ন্তপ্সপ্লন্দ্বক্তজনঃব্ধ ন্তপ্সড়ন্দ্বক্তব্ধক্তজত্রুস্তু ব্ধড়ন্দ্ব ব্দব্ধভ্রস্তুভ প্সন্দ্র ন্তপ্সড়ন্দ্বক্তজনঃব্ধ ত্রন্তব্ধনপ্সং প্সন্দ্র স্তুনন্দ্রন্দ্রন্দ্বক্তজন্দ্বঃব্ধ প্লন্দ্বব্ধপ্তব্দ” ছত্নক্তজপ্সন্তন্দ্বন্দ্বস্তুনঃব্ধব্দ প্সন্দ্র ত্মপ্সস্ত্রপ্ত ত্রপ্সন্তনন্দ্বব্ধস্তু ১৮৯৯গ্ন এটা ব্যাপক অনুধাবনের ফল। এই অনুধাবনের সূত্রেই পদার্থবিজ্ঞানের এক নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মোচিত হয়েছিল, বোঝা গেল আণবিক গঠনশৈলীর বিভিন্নতার কারণেই বিভিন্ন পদার্থের তৈরী কোহেরার বিদ্যুৎ পরিবহন ক্ষমতার বিভিন্নতা প্রদর্শন করছে। অজান্তেই আধুনিক ত্রপ্সপ্তনস্তু ত্রব্ধব্ধন্দ্ব ত্নড়ম্ভন্দনন্তব্দ-এর গোড়াপত্তন হয়ে গেল এইভাবেই-শ্রীবসুর গবেষণার ফলেই। তিনি দেখলেন লোহা এবং পারদ নিয়ে তৈরী কোহেরারই সবচাইতে সুবেদী। পারদের এইমতো ব্যবহার সে সময় একেবারে এক মৌলিক চিন্তার পরিচয়। তিনি একটি ‘হু’ আকৃতি নলে পারদ এবং লৌহচূর্ণ নিলেন। পারদ ও লৌহচূর্ণ সংস্পর্শকে সুনিপুণ ভাবে নিয়ন্ত্রণে রেখে দেখলেন আপতিত তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ বিদ্যুৎ সংকেতে পরিণত হচ্ছে একটানা এবং এই সংকেতকে টেলিফোন গ্রাহক যন্ত্রে শব্দে পরিণত করা যায়। এই কোহেরারই সেই সময়ের সবচেয়ে দক্ষ কোহেরার বা ডিকেক্টর ছিল। আই ই ই ই র ছচ্ঃব্দব্ধনব্ধন্তব্ধন্দ্ব প্সন্দ্র ড্রপ্তন্দ্বন্তব্ধক্তজনন্ত্রপ্তত্রুস্তু ড্রপ্তন্দ্বন্তব্ধক্তজপ্সঃনন্তব্দ ড্রব্ধঃন্দ্বন্দ্বক্তজব্দগ্ন সংগৃহীত তথ্যে জানা যাচ্ছে যে মার্কোনি ছণ্ড ত্ত্রক্তজন্তপ্সঃনগ্ন হুবহু এই কোহেরারই ব্যবহার করেছিলেন আটলান্টিক পারের সঙ্কেত ধরতে। শুধুমাত্র বিজ্ঞানীমহলকে এবং পেটেন্ট কর্তৃপক্ষকে বিভ্রান্ত করতে ‘হু’ নলের পরিবর্তে একটি সোজা নলকে ব্যবহার করেছিলেন। যার মধ্যে ছিল লৌহ ও নিকেল চূর্ণের পারদসিক্ত সংমিশ্রণ। দ্রুত পেটেন্ট করে নেওয়ার সুবাদে তিনিই ‘রেডিও’ আবিষ্কারক হিসেবে ‘নোবেল’ পুরস্কার পেয়ে যান। বঞ্চিত হন জগদীশ চন্দ্র বসু। এই বঞ্চনার স্বরূপটি স্পষ্ট হয়েছে প্রায় একশত বছর পরে — যখন সামনে এল জগদীশ বসুর অত্যাশ্চর্য গবেষণার ও কৃৎকৌশলের আরো অনেক চমকপ্রদ তথ্য। আই ই ই ই-র ডঃ প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্‌স্টিটিউটের জার্নালে বেতার যোগাযোগ এবং জগদীশ চন্দ্র বসুর অবদান নিয়ে প্রবন্ধ লিখে আই ই ই ই -র প্রযুক্তিবিদদের নজর কাড়েন, আই ই ই ই-র তথ্য সংগ্রহ শুরু করে। একটি টিম আই ই ই ই-থেকে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে এসে জগদীশ বসু আবিস্কৃত বিভিন্ন যন্ত্রাদির কর্মকুশলতা

(এরপর ১৩ পাতায়)

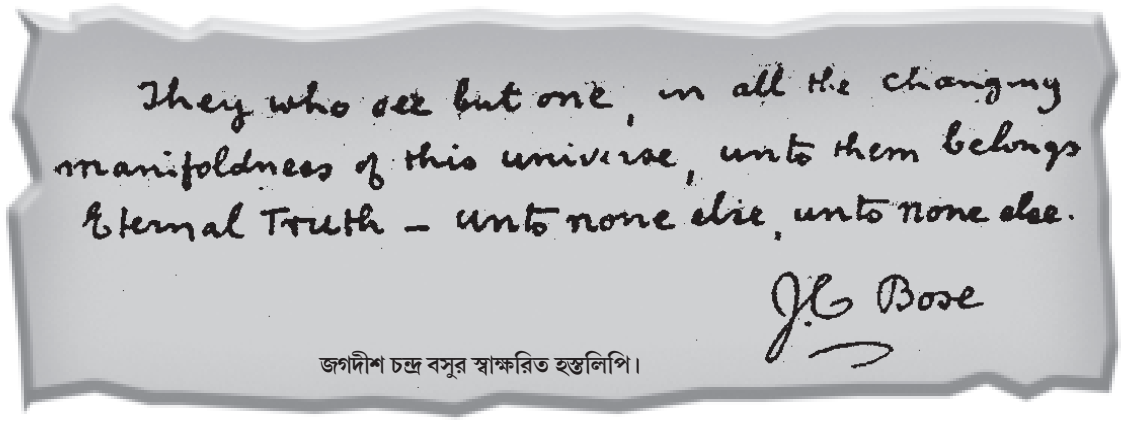

জগদীশ চন্দ্র বসুর স্বাক্ষরিত হস্তলিপি।

“কেহ কেহ দুঃখ করিয়াছেন যে বঙ্গের দুই একটি কৃতী সন্ত
ভাষায় প্রকাশ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না
প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহা সর্বাগ্রে মাতৃভাষায় প্রকাশিত হইয়া
সুধী শ্রেষ্ঠদিগের নিকট তাহা বহুদিন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে স
বিদেশের হল-মার্কা না দেখিতে পাইলে, কোনও সত্যের মূল
ক্ষেত্রে ভারতবাসীর যে নিন্দা ঘোষিত হইত, তাহার বিরুদ্ধে যুবি
কিন্তু ঘোরতর নিরাশার মধ্যেও আমি পরাজয় স্বীকার করি ন
করিয়া থাকি, তবে তাহা দেশলক্ষ্মীর চরণেই নিবেদন করিতে

দেশপ্রেমিক বিজ্ঞানী

ঋষি জগদীশ চন্দ্র বসু

রঞ্জন কুমার ঘোষ

আচার্য জগদীশচন্দ্র পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। দিগ্বিজয়ী বিজ্ঞানীই তো জগদীশ চন্দ্রের একমাত্র পরিচয় নয় — ঋষিপ্রতিম এই নিরলস সত্যসন্ধানী মানুষটি ছিলেন একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিকও। তাঁর কর্মোদ্দীপনা ও প্রেরণার মূলে ছিল ভারতীয় দর্শনের মৃত্যুঞ্জয়ী শিক্ষা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার মাঝে তিনিই প্রকৃত সেতুবন্ধ রচনা করেছিলেন।

বর্তমান কালে জগদীশ চন্দ্রের এই পরিচয় বিস্মৃতপ্রায়। অথচ বাঙালীর কর্মজগতে ও চিত্তাকাশে আজ যে দৈন্য ও অন্ধকার নেমে এসেছে তা অপসারণ করতে হলে, বহুমুখী এই দুর্জয় প্রতিভার সাধনা ও কর্মকৃতির সঙ্গে সঙ্গে এই দিকটির কথাও ব্যাপক আলোচনার প্রয়োজন আছে।

১৯০০ খৃস্টাব্দে যখন তিনি ইউরোপে তাঁর তৈরি কৃত্রিম চোখের ওপর দৃশ্য ও অদৃশ্য রশ্মির কাজ অবিকল প্রাণীদের চোখের মতো পরীক্ষা করে দেখালেন, তখন বিজ্ঞানীরা এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তাঁরা জগদীশচন্দ্রকে ইংল্যাণ্ডের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ বেতনে এক অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করে সেখানে গবেষণা করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু উচ্চবেতন, গবেষণার সুযোগ প্রভৃতির পরিবর্তে জগদীশচন্দ্র কিছুতেই তাঁর জন্মভূমিকে ত্যাগ করতে সম্মত হননি।

একটি চিঠিতে জগদীশচন্দ্র লিখেছেন, "তোমাদের স্বরে আমি ক্ষীণ মাতৃস্বর শুনতে পাই — সেই মাতৃদেবী ব্যতীত আমার আর কী উপাস্য আছে? তাঁহার বরেই আমি বল পাই, আমার আর কে আছে?" এই কথাগুলি থেকে তাঁর অন্তরের গভীর দেশপ্রেম সকলের চোখের সামনে স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

জগদীশচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে কত অসুবিধার মধ্যে যে গবেষণা করেছেন, গর্ভণমেন্ট তাঁর গবেষণার পথে কত যে অসুবিধার সৃষ্টি করেছেন — তা পরাধীন ভারতে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের অন্তরের নীচতারই পরিচায়ক।

ভগিনী নিবেদিতা ১৮ এপ্রিল, ১৯০৩ সালে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন — "The college routine was made as arduous as possible for him, so that he could not have the time he needed for investigation. And every little thing that happened was made an excuse for irritating correspondence and flagrant misrepreseutation." বিদেশী গর্ভনমেন্ট জগদীশচন্দ্রকে ব্যক্তিগত গবেষণার কাজে প্রেসিডেন্সি কলেজের পরীক্ষাগার ব্যবহার করতে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না।

এত বাধা ও অসুবিধা সত্ত্বেও জগদীশচন্দ্র দেশমাতৃকার সেবাকেই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলে মনে করেছেন।

অধিকাংশ বিজ্ঞানী নাস্তিক ও জড়বাদী। তাঁরা জড়ের দ্বারা চেতনের ও চেতনার ব্যাখ্যা করতে প্রয়াসী। তাঁরা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। হৃদয়, প্রাণ, মন, আত্মা যে শব্দই ব্যবহার করা যাক না কেন তার সমস্তই জড়ের কোন গুণ বা প্রক্রিয়ার ফল বোঝে। তাঁরা আত্মাকে অনাত্ম, শ্রেষ্ঠকে অশ্রেষ্ঠ দ্বারা ব্যাখ্যা করে জড়কেই একমাত্র সত্তা বলতে চান। কিন্তু জগদীশচন্দ্র ছিলেন এর বিপরীত মার্গে। তিনি বিশ্বের সর্বত্র প্রাণের আত্মার শ্রেষ্ঠ লীলা দেখতে ও দেখাতে চেয়েছিলেন। এখানেই তাঁর ভারতীয়ত্ব, তাঁর হিন্দুত্ব।

উচ্চ বেতনে ইউরোপের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রেষ্ঠ গবেষণাগারে গবেষণা করার সুযোগও দেশপ্রেমিক জগদীশচন্দ্র অবহেলায় ত্যাগ করেছেন।

১৯১৬ খৃস্টাব্দ। সুভাষচন্দ্র যখন অধ্যাপক ওটেনের অপমানজনক কথা ও রূঢ় ব্যবহারে মর্মাহত হয়ে আন্দোলন করেছিলেন, তখন অধ্যাপক জগদীশ চন্দ্রই ছাত্রদের সেই আন্দোলনে সহানুভূতি প্রকাশ করেছিলেন। তিনি সুভাষচন্দ্রকে বলেছিলেন "তোমরা ঠিক করেছ"। তিনিই ছিলেন সেই আন্দোলনের নৈতিক শক্তি (moral force)।

জগদীশ চন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলালের বন্ধু ছিলেন। তিনি দ্বিজেন্দ্রলালকে দেশপ্রেমে কি রকম উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তা নিচের ঘটনা থেকে বোঝা যায়।

গয়ার বিষ্ণুমন্দির আদিতে বৌদ্ধ মন্দির বলে বৌদ্ধ রা দাবি জানান। স্বত্ব নির্ধারণের জন্য ১৯০৮ সালের জুন মাসে সিস্টার নিবেদিতা, জগদীশচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি দেশবরেণ্য ব্যক্তিরা গয়ায় উপস্থিত হন। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তখন গয়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি মাননীয় অতিথিদের যথোচিত সম্বর্ধনা করেন। দেশপ্রেমমূলক স্বরচিত গান গেয়ে ও নাটকের অংশবিশেষ পড়ে অতিথিদের আপ্যায়িত করেন। জগদীশ চন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলালের অসাধারণ ক্ষমতার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে ওঠেন। তিনি দ্বিজেন্দ্রলালকে তাঁর রচনা সম্বন্ধে যে পরামর্শ দেন তার ফলে, দ্বিজেন্দ্রলাল কেমন গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত হন তার পরিচয় পাই দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লেখা দেবকুমার রায়চৌধুরীর একটি চিঠিতে।

১৯০৭ সালের ২৫ জুন দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর বন্ধু ও জীবনীকার দেবকুমারকে লেখেন — "গত পরশু স্বদেশপ্রাণ মনীষী জগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয় আমাকে স্বদেশী সঙ্গীতরচনা সম্পর্কে একটা বিবেচ্য পরামর্শ দিয়ে গেলেন। পরামর্শটি জগদীশচন্দ্রের নিজের ভাষায় এই রকম —"আপনি রাণা প্রতাপ, দুর্গাদাস প্রভৃতি চরিত-গাথা বঙ্গবাসীকে শুনাইতেছেন বটে কিন্তু তাঁহারা বাঙালীর সম্পূর্ণ নিজস্ব সম্পত্তি বা একেবারেই আপন ঘরের জল নহেন। এমন আদর্শ বাঙালীকে দেখাইতে হইবে — যাহাতে এই মুমূর্ষু জাতটা আত্মশক্তিতে আস্থাবান হইয়া, আত্মোন্নতির জন্য আগ্রহান্বিত হয়। আমাদের এই বাংলা দেশের আবহাওয়ায় জন্মিয়া আমাদের ভিতর দিয়াই বাড়িয়া উঠিয়া, সমগ্র জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিয়াছেন, যদি সম্ভব হয়, যদি পারেন তো একবার সেই আদর্শ বাঙালী জাতিকে দেখাইয়া — আবার তাহাদিগকে জিয়াইয়া মাতাইয়া তুলুন।"

(— "দ্বিজেন্দ্রলাল" দেবকুমার রায়চৌধুরী ১৩২৪ সাল পৃঃ ৫৭২)

মাতৃভূমির সুসন্তান দেশভক্ত জগদীশ চন্দ্রের এই অমূল্য উপদেশ কবির অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে গিয়ে তুমুল আলোড়ন তুলল এবং তারই ফলে মহাপ্রাণ দ্বিজেন্দ্রলাল সেই দেশাত্মবোধের মহান সঙ্গীত — "বঙ্গ আমার জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ" রচনা করে বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী জাতিকে সমৃদ্ধ ও উদ্বুদ্ধ করে তুললেন।

পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কিত স্মৃতি কথায় জগদীশ চন্দ্র যা লিখেছেন —

"কয়েক বৎসর পূর্বে একবার গয়ায় বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেখানে দ্বিজেন্দ্রলাল আমাকে তাঁহার কয়েকটি গান শুনাইয়াছিলেন। সেদিনের কথা কখনও ভুলিব না। নিপুণ শিল্পীর হস্তে, আমাদের মাতৃভাষার কি যে অসীম ক্ষমতা সেদিন তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। যে ভাষার করুণ ধ্বনি মানবের অক্ষমতা, প্রেমের অতৃপ্ত বাসনা ও নৈরাশ্যের শোক গাহিয়াছিল — সেই

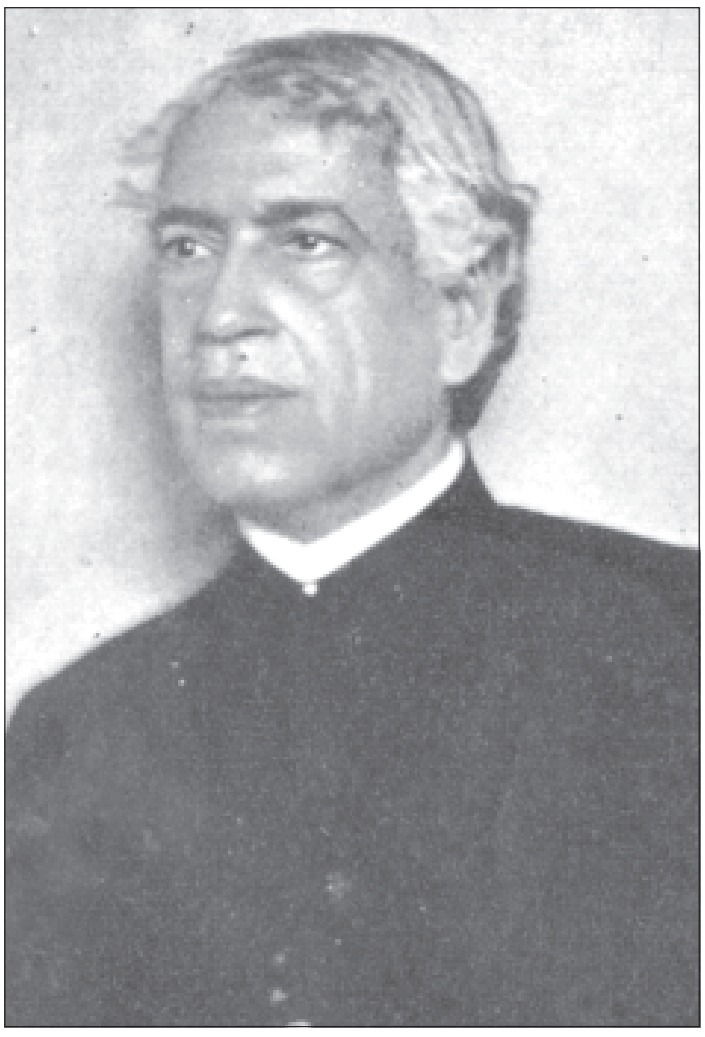

ভাষারই অন্য রাগিণীতে অদৃষ্টের প্রতিকূল আচরণে উপেক্ষা, মানবের শৌর্য ও মরণের আলিঙ্গন ভিক্ষা ভৈরব নিনাদে ধ্বনিত হইল।

"ধরণী এক্ষণে দুর্বলের ভার বহনে প্রপীড়িতা। রুদ্রসংহার মূর্তি ধারণ করিয়াছেন। বর্তমান যুগে বীর্য অপেক্ষা ভারতের উচ্চতর ধর্ম নাই। কে মরণ সিন্ধু মন্থন করিয়া অমরত্ব লাভ করিবে? ধর্মযুদ্ধের এই আহ্বান দ্বিজেন্দ্রলাল বজ্রধ্বনিতে ঘোষণা করিলেন।" গাছের যে প্রাণ আছে জগদীশচন্দ্র যে যন্ত্রের সাহায্যে তা প্রমাণ করেন — তার নাম ক্রেস্কোগ্রাফ। জগদীশ চন্দ্র এক জায়গায় বলছেন, "ইচ্ছা ছিল কলের নাম ক্রেস্কোগ্রাফ না রাখিয়া 'বৃদ্ধি মান' রাখি। প্রথমে এর নাম দিয়াছিলাম কুঞ্চ নমান বা শোষণমান। কিন্তু ইংরাজকে দিয়া বাংলা নাম বলাইতে পরিলাম না। সুতরাম ক্রেস্কোগ্রাফ-ই ভাল। জগদীশচন্দ্রের এই বাংলাভাষার প্রতি দুর্বলতা তাঁর দেশপ্রেমেরই পরিচায়ক।

১৯১৪ সালে রয়াল ইনস্টিটিউশনে জগদীশচন্দ্র যখন দ্বিতীয়বারের জন্য বক্তৃতা দিতে আসেন তখন এই ইনস্টিটিউশনের কয়েকজন সহকারী বক্তৃতায় সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে আসেন। কিন্তু জগদীশচন্দ্র তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেছিলেন — "এই পরীক্ষার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলি শুধুমাত্র ভারতের দান। তাই শুধু ভারতীয়গণকে এ বিষয়ে পরীক্ষা দেখাতে দিন।" জগদীশ চন্দ্রের দেশের প্রতি এই স্বাভিমানে তাঁরা স্বভাবতই সাহায্য করা থেকে বিরত থাকেন। জগদীশ চন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান গবেষণাগার 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' নামের মধ্যেই তাঁর তীব্র স্বাদেশিকতার প্রমাণ পাওয়া যায়। গবেষকের মানসপদ্মের বিজ্ঞান-সরস্বতীকে হৃদয় পদ্মের উপর প্রতিষ্ঠা করতেই এই গবেষণাগার। এই গবেষণাগারে প্রতীকটিও

(এরপর ১৩ পাতায়)

একটি কৃতী সন্তান তুচ্ছ যশের মায়াতে স্বীয় আবিস্কার বিদেশী পারিলেন না। আমার যাহা কিছু আবিস্কার সম্প্রতি বিদেশে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু আমার একান্ত দুর্ভাগ্যবশত এদেশের লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। আমাদের স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ও ও সত্যের মূল সম্পর্কে একান্ত সন্দিহান হইয়া থাকেন। বিজ্ঞান হার বিরুদ্ধে যুঝিতে যাইয়া আমি বারংবার প্রতিহত হইয়াছিলাম। স্বীকার করি নাই। এই সুদীর্ঘ পরিণামে যদি জয়মাল্য আহরণ নিবেদন করিতেছি।"

— জগদীশচন্দ্র বসু

‘পবিত্র ঈদ’ ও শারদোৎসব

কিছুকাল যাবৎ লক্ষ্য করছি, বামফ্রন্ট সরকার ও তার জাতশত্রু মমতা ব্যানার্জী এবং তাঁর পার্টি ‘তৃণমূল কংগ্রেস’ জনগণকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে— পবিত্র ঈদ ও শারদোৎসবে। লক্ষণীয়, সংখ্যালঘুদের ‘ঈদ’ অগ্রাধিকার তো পাচ্ছেই;আবার শব্দটির অরিজিন্যালিটিও থাকছে। অপর পক্ষে সংখ্যাগুরুদের ‘দুর্গা পূজা’ ‘শারদোৎসব’ নামাঙ্কিত হয়ে পশ্চাৎবর্তী হয়েছে। বস্তুত ভোটের রাজনীতির কারণে পার্টিগুলোর নেতৃবৃন্দ সেকুলার হওয়ার জোর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ। কাজেই ‘দুর্গা পূজা’ শব্দটির মধ্যে যে হিন্দু-হিন্দু গন্ধ, তা দূর করতে তারা ‘শারদোৎসব’ শব্দটি চালু করেছেন। কী সূক্ষ্ম কারুকাজ! হিন্দু নেতাগণ ইদানীং ইফতার পার্টিও করছেন। অদূর ভবিষ্যতে তাঁদের মনে ‘সুন্নত’ করার উৎসাহ জাগবে কিনা সে অপেক্ষায় আছি। হিন্দু মুসলিম মিলনের সেটাও একটা পন্থা বৈকি!

অক্ষয় কুমার সরকার, দত্তপুকুর, উঃ ২৪ পরগণা।

পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ

সন্ত্রাসবাদীদের লালন-পালন করার জন্য শাসন ক্ষমতা দখলের পর থেকেই সিপিএম সরকার পুলিশের হাতে শেকল পরিয়ে রেখেছে। এখন পুলিশের পক্ষে অপরাধীদের বিরুদ্ধে সরাসরি কোনও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের উপায় নেই। সবই নির্ভর করছে সিপিএমের নেতা-কর্মীদের মর্জির উপরে। দীর্ঘদিন ধরে এমনই অবস্থা চলার ফলে প্রশাসনিক পরিকাঠামোটির এমন ভঙ্গুর অবস্থা হয়েছে যে, পুলিশ তাদের বুলেট বন্দুক পিস্তলের হিসাব -কিতাব রাখার মানসিকতাকেও হারিয়ে ফেলেছে। সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক সংবাদ, ১৯৭৯ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত কৃষ্ণনগরে জেলা পুলিশের অস্ত্রাগারের অধীক্ষক ছিলেন শঙ্কর চক্রবর্তী নামে এক সাব-ইনস্পেক্টর। সেই অস্ত্রাগার থেকে বুলেট-পিস্তল এনে পুলিশ আবাসনে বসে দুষ্কৃতীদের সরবরাহ করে বেশ ভালো পয়সা উপার্জন করেছেন উক্ত পুলিশ কর্মী। বছর খানেক আগে সি আই ডি-তে যোগ দেয় ওই হীন মানসিকতার পুলিশ কর্মী। এখনও তার সেই অস্ত্র ব্যবসা ছড়িয়ে পড়েছে উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বাংলাদেশ লাগোয়া বনগ্রাম সীমান্ত পর্যন্ত। সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয় হল, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে অস্ত্রাগারে কত বুলেট-বন্দুক-পিস্তল ছিল, কত আছে তার হিসেব-নিকেশ দেখার মতো দায়িত্ববোধ হারিয়ে ফেলেছে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ। এভাবেই পশ্চিমবঙ্গ এখন সন্ত্রাসবাদীদের একটি নিশ্চিন্ত আবাসনে পরিণত হয়েছে।

সম্প্রতি সেনাবাহিনীর একটি সূত্র থেকে প্রকাশিত সংবাদ, গুয়াহাটি বিস্ফোরণের নির্দেশ আসে পশ্চিমবঙ্গের সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটি থেকে। সত্যি, সন্ত্রাসবাদীরা বড়ই অকৃতজ্ঞ। তা না হলে শালবনীতে বুদ্ধদেব বাবুর শুভ কর্মে এমন বিঘ্ন ঘটায়। তবে নিন্দুকেরা যে যাই বলুক, নাট্যকার বুদ্ধদেব বাবুর সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম শিল্প নাটকের বিভিন্ন অঙ্কে শান্তির চেয়ে অশান্তিই ছিল বেশী। এখন শালবনী শিল্প নাটকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রথম দৃশ্যেই ভয়ঙ্কর অশান্তি। দেখা যাক, এই নাট্যানুষ্ঠান শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। তবে সাধারণ মানুষ যতই প্রশ্ন তুলুক — “একেই কি বলে প্রশাসন? এতে সিপিএমের কিছু যায় আসে না। কারণ, এটাই তাদের মতাদর্শ।

শ্যামাপ্রসাদ দাস, অশোক নগর, উত্তর ২৪ পরগণা।

মানবিকতা

গত দুর্গাপূজার সময় ৬।১০।২০০৮ সপ্তমীর রাতে বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার অন্তর্গত পাঁচড়া গ্রামের স্বপন রক্ষিতের পরিবারের ১০ জন টাটা সুমো ভাড়া করে ঠাকুর দেখতে যান। জামালপুর থেকে ঠাকুর দেখে ফেরার পথে টাটা সুমো ইডেন ক্যানেলে পড়ে গেলে একই পরিবারের দশ (১০) জনের সলিল সমাধি ঘটে। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কারণে রাজ্যবাসী ওই ঘটনা জানতে পারে। আমার ধারণা পূজার সময় একই পরিবারে ঘটে যাওয়া এতবড় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা বাংলায় এই প্রথম। কখনও যেন এরূপ আর না ঘটে, ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা।

কিন্তু ভেবে খুব আশ্চর্য লাগে যে যারা আমাদের জন প্রতিনিধি— এম এল এ, এম পি ওই পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানোর মতো মানবিকতা দেখাতে পারেননি। এমনকী রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয় কেউই ওই পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেননি। পরিবারের পাশে পৌঁছানো তো অনেক পরের কথা।

এই রাজ্যের সব কিছু কি রাজনীতি দিয়েই বিচার হবে? মানবিকতা কি লোপ পাচ্ছে? জন-প্রতিনিধিদের কাছ থেকে এতটুকু আশা করা কী অন্যায়? মানবিকতা, মূল্যবোধ এসব নিয়ে অনেক লেখালেখি হচ্ছে, তার পরেও এমন একটা মর্মান্তিক বিষয়ে বিশিষ্ট নেতৃত্বের পক্ষ থেকে কোনও অভিব্যক্তি প্রকাশ পাচ্ছে না দেখে, সেই সব নেতৃত্ব সম্বন্ধে বড় একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন দেখা দেয়।

শ্রীকান্ত নন্দী, পাঁচড়া, বর্ধমান।

বেদের দেবতা বিশ্বকর্মা

স্বস্তিকায় নন্দলাল ভট্টাচার্য মহাশয়ের “বেদের দেবতা বিশ্বকর্মা” নিবন্ধে “ছিন্ন মস্তক” বিষ্ণুর দেহে একটি ঘোড়ার মুণ্ড জুড়ে দেওয়া’র কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কখন কীভাবে বিষ্ণুর মুণ্ড ছেদন হয়েছিল পত্রিকা মারফৎ জানাবার জন্য শ্রীভট্টাচার্য মহাশয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি।

প্রিয়কান্ত ভট্টাচার্য, কোন্নগর, হুগলী।

যুগল কিশোর জৈথলিয়া সংবর্ধিত

সংবাদদাতা ।। বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং সাহিত্যকার তথা বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের প্রাক্তন সভাপতি যুগল কিশোর জৈথলিয়া-কে আচার্য বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী হিন্দী সেবা সম্মানে সম্মানিত করা হল। গত ১১ নভেম্বর উত্তরপ্রদেশের এটাওয়ায় এক অনুষ্ঠানে শ্রীজৈথলিয়ার হাতে ওই সম্মানের প্রতীক স্বরূপ শাল ও মানপত্র তুলে দেন ছত্তিশগড়ের রাজ্যপাল এস এল নরসিংহ। শ্রীজৈথলিয়ার সমাজসেবা এবং তাঁর হিন্দী ভাষার প্রতি অবদানের জন্য তাঁকে এই সম্মান দেওয়া হয়। সম্মান প্রদানের এই অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি বিকাশ শ্রীধর সিরপুরকর। অনান্যদের মধ্যে ছিলেন পূর্ব রাজ্যপাল ত্রিলোকীনাথ চর্তুবেদী, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তিভূষণ, উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ কিশোরী নাথ ত্রিপাঠী সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

উত্তরবঙ্গে বৌদ্ধিক সম্মেলন

সন্ত্রাসবাদ, নকসালবাদ, মাওবাদ, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি, ধর্মান্তরকরণ, ও কমিউনিস্ট বর্বরতার প্রকোপ থেকে রাষ্ট্রকে সুরক্ষিত রাখতে ও দেশের যুবশক্তিকে সঠিক পথনির্দেশ এবং সঠিক কাজে নিয়োজিত করার সংকল্প নিয়ে, গত ৪ অক্টোবর উত্তরবঙ্গের কালিম্পং নগরে এক ‘বৌদ্ধিক সম্মেলন’ অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে নগরের স্বয়ংসেবকরা ছাড়াও বিশিষ্ট নাগরিকরা উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে মুখ্যবক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারী মণ্ডলের সদস্য ইন্দ্রেশ কুমার। তিনি বলেন, বর্তমানে প্রায় ছাব্বিশ কোটি ভারতবাসী দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করছে। তাদের সম্মান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা তথা দেশের মুখ্য ধারায় আনার কাজ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ করে চলেছে। মুখ্য অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অমর লামা। এছাড়া উত্তরবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক অদ্বৈত চরণ দত্ত এবং কালিম্পং জেলা সঙ্ঘচালক অম্বিকা প্রসাদ শর্মা উপস্থিত ছিলেন।

শোক সংবাদ

অশ্বিনী কুমার দত্ত গত ১৩ অক্টোবর ভেলোর (তামিলনাড়ু)-এ চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ওইদিনই সন্ধ্যায় ভেলোরের পালার শ্মশানঘাটে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়। তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বাঁকুড়া জেলার খাতড়া মহকুমা বৌদ্ধিক প্রমুখ সুভাষ দত্ত-এর পিতৃদেব। তিনি খাতড়া শহরের একজন বহু পুরাতন ব্যবসায়ী। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বৎসর।

তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র, পুত্রবধু, ছয় নাতনী ও এক কন্যা রেখে গেছেন।

❁ ❁ ❁

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পশ্চিম কোচবিহার জেলার জেলা শারীরিক প্রমুখ স্বর্ণেশ্বর দেব সিংহের পিতা সিদ্ধেশ্বর দেব সিংহ গত ২৪ অক্টোবর পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিন পাঁচ পুত্র এক কন্যা সহ নাতি-নাতনীদের রেখে গেছেন।

❁ ❁ ❁

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বাউল শাখার স্বয়ংসেবক পবিত্র সরকারের মাতৃদেবী তরুবালা সরকার গত ১৮ অক্টোবর পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তাঁর দুই ছেলে, তিন মেয়ে ও নাতি-নাতনি বর্তমান।

❁ ❁ ❁

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর মহকুমা বৌদ্ধিক প্রমুখ বলরাম দাসে’র মাতৃদেবী যশোদা রানী দাস গত ২৭ অক্টোবর গত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৮০ বছর। তিনি দুই ছেলে সহ নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

❁ ❁ ❁

বালুরঘাটের জনসঙ্ঘের প্রাক্তন কর্মী, সমাজসেবী সফল নট ও নাট্যকার, ক্রীড়াপ্রেমী সত্যরঞ্জন তালুকদার (গোবিন্দ দা) গত ২৭ অক্টোবর ৭৫ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। তিনি স্থানীয় নদীপার এন সি হাইস্কুলের অবসর প্রাপ্ত সহকারী প্রধান শিক্ষক ছিলেন। স্বস্তিকা-র আজীবন গ্রাহক ও পাঠক। মৃত্যুকালে রেখে গেছেন স্ত্রী, দুই কন্যা, নাতি-নাতনি সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ অনুরাগী।

ঢাকায় শিল্প একাডেমিতে মঞ্চস্থ হল শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

একটি স্থানীয় মণিপুরী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ঢাকায় ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ নাটিকা পরিবেশন করে সবার মন জয় করে নিল। এই নাটক মঞ্চ স্থ হয় গত ৯ নভেম্বর রাসপূর্ণিমাকে উপলক্ষ্য করে, ঢাকার শিল্পকলা একাডেমি-র সভাগারে। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে ভালো সংখ্যায় মণিপুরী জনগোষ্ঠীরা বসবাস করেন। ‘নাটপালা’র দ্বাদশ বার্ষিক অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র শ্রীকৃষ্ণ। জ্যোতি সিন্‌হার ‘রাধা’ এবং বড়াই বুড়ির ভূমিকায় শুক্লা সিন্‌হার অভিনয় এতই ভালো হয়েছে যা শিল্পীর অভিনয় নৈপুণ্যকে স্বীকার করতেই হয়। অপর্ণা সিন্‌হা-র মূল শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে অভিনয়ও সাবলীল। ঐতিহ্যমণ্ডিত মণিপুরী বাদ্যযন্ত্রের অনুষঙ্গ হিসেবে মৃদঙ্গ, ঢোল এবং মন্দিরার ব্যবহারেও ছিল মুন্সীয়ানার ছাপ।

শিলিগুড়িতে লক্ষ্মণানন্দ সরস্বতী শ্রদ্ধাঞ্জলি সমিতির সভায় বক্তব্য রাখছেন বিদ্যা ভারতীর সম্পাদক লক্ষ্মীনারায়ণ ভালা।

প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান

জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা ঃ বৈদিক যুগ

দিনের আকাশে সূর্য ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু রাতের আকাশে ঝলমল করে চন্দ্র, গ্রহ-উপগ্রহ এবং অগণিত তারকা। এদের লক্ষ্য করে প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মনে একটা প্রশ্ন ঘুরপাক খেত— মহাকাশে রাতে যাদের দেখা যায় দিনে তাদের দেখা যায় না কেন? কোথায় যায় তখন এরা? প্রতিদিন এরা পূর্ব থেকে পশ্চিমে সরে যায় কেন? রোজ কেন সূর্য উদয় হয় আবার অস্ত যায়। এইসব গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধির সঙ্গে ঋতু পরিবর্তনের কোনও সম্পর্ক আছে কি? এমনই নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে জ্যোতির্বিদ্যার সূত্রপাত।

কমলবিকাশ ব্যানার্জী

পৃথিবীতে কবে কোথায় প্রথম মানব সভ্যতা স্থাপিত হয়েছিল তা জানা সম্ভব নয়। তবে যে কটি প্রাচীন সভ্যতার কথা আমাদের জানা আছে তাদের মধ্যে ভারতীয় সভ্যতা অন্যতম। খ্রীঃ পূর্ব ৩২৫০ অব্দের অনুরূপ সময়ে সিন্ধুনদের অববাহিকায় যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, ভারতীয় ভূ-খণ্ডে সেটাই প্রাচীনতম সভ্যতা বলে আমরা ধরে নিই। সিন্ধু উপত্যকার এই সভ্যতা সিন্ধু সভ্যতা নামে পরিচিত। মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা প্রভৃতি স্থানে এই সভ্যতা প্রথম স্থাপিত হলেও, পরবর্তী কালে তা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এই প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে যে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে তা থেকে অনুমান করা যায় যে— সে যুগে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার তেমন চল ছিল না। প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় বেদে। বেদ ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ। বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান। আদিতে বেদ অবিভক্ত ছিল। পরবর্তীতে এটি চার খণ্ডে বিভক্ত হয় — ঋক, সাম, যজুঃ ও অর্থব। এদের মধ্যে ঋগ্বেদ শুধু ভারতে নয়, সম্ভবত সমগ্র পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ।

মানুষ কৃষিকাজ আয়ত্ত্ব করার পরেই সময়ের হিসেব রাখার প্রয়োজন অনুভব করে। বৈদিক যুগের ভারতীয়রাও এই অনুভব করেছিলেন। তবে অন্যান্য প্রাচীন সভ্য জাতিগুলির জীবন ধারা আর বৈদিক যুগের ভারতীয়দের জীবনধারার মধ্যে অনেকটাই পার্থক্য ছিল। সে যুগের ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল ধর্মের উপর ভিত্তি করে। ফলে নানা ধর্মানুষ্ঠান এবং যাগ-যজ্ঞাদি সারা বছর ধরে অনুষ্ঠিত হত। আর তাকে ঘিরেই এদেশে জ্যোতির্বিদ্যার উন্নতি ঘটেছিল। বৈদিক যুগের মাঝামাঝি সময়ে রচিত হয় ব্রাহ্মণ সংহিতাদি। সে সময়েই এদেশে জ্যোতির্বিদ্যার বিশেষ অগ্রগতি ঘটেছিল।

বৈদিক যুগে জ্যোতির্বিজ্ঞান ছিল বেদাঙ্গের অঙ্গীভূত। প্রথমদিকে এদেশে জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা ধর্মানুশাসিত হলেও, পরবর্তীকালে ধর্মের প্রয়োজনকে অতিক্রম করে ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক চর্চায় পরিণতি লাভ করে।

দিনের আকাশে সূর্য ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু রাতের আকাশে ঝলমল করে চন্দ্র, গ্রহ-উপগ্রহ এবং অগণিত তারকা। এদের লক্ষ্য করে প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মনে একটা প্রশ্ন ঘুরপাক খেত— মহাকাশে রাতে যাদের দেখা যায় দিনে তাদের দেখা যায় না কেন? কোথায় যায় তখন এরা? প্রতিদিন এরা পূর্ব থেকে পশ্চিমে সরে যায় কেন? রোজ কেন সূর্য উদয় হয় আবার অস্ত যায়। এইসব গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধির সঙ্গে ঋতু পরিবর্তনের কোনও সম্পর্ক আছে কি? এমনই নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে জ্যোতির্বিদ্যার সূত্রপাত। মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি লক্ষ্য করে প্রাচীন ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বেশ কিছু নক্ষত্র এবং নক্ষত্রমণ্ডল চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই সব নক্ষত্রমণ্ডলের সঙ্গে চাঁদের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে — তা তাঁরা জানতে পেরেছিলেন। সেসব কথা ঋগ্বেদে এবং তৈত্তিরীয় সংহিতায় উল্লেখ আছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনেক কথা অবশ্য রূপক আকারে এইসব গ্রন্থে লিখিত আছে। যেমন, তৈত্তিরীয় সংহিতায় (২।৩।৫) লেখা আছে যে প্রজাপতি তার তেত্রিশটি কন্যাকেই রাজা সোমের হাতে তুলে দেন। এখানে সোম হলেন চন্দ্র এবং প্রজাপতির তেত্রিশ কন্যা হল তেত্রিশটি নক্ষত্র। কৃত্তিকার সাতটি এবং নক্ষত্রচক্রের অবশিষ্ট ছাব্বিশটি নক্ষত্র নিয়ে এই তেত্রিশটি নক্ষত্র বা প্রজাপতির তেত্রিশ কন্যা। পুরাণে অবশ্য সাতাশটি নক্ষত্রের কথা বলা হয়েছে। এখানে কৃত্তিকাকে একটি নক্ষত্র বা তারকামণ্ডল হিসেবে ধরা হয়েছে। প্রতি সন্ধ্যায় চন্দ্র এক একটি নক্ষত্রের পটভূমিতে বিরাজ করে। এইভাবে সাতাশ রাত্রি অতিক্রান্ত হলে সে আবার ফিরে আসে প্রথম নক্ষত্রের পটভূমিতে। সাতাশ দিনের এই চন্দ্রপথ বা চন্দ্রের আবর্তনকাল অবলম্বন করেই চান্দ্র তিথির উদ্ভব হয়েছে।

চাঁদের যে আলো নেই একথা ঋগ্বেদ যুগের ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জানতেন। সূর্যের আলোই যে চাঁদকে আলোকিত করে সে কথা ঋগ্বেদে (১।৮৪।১৫) উল্লেখ আছে। সেখানে বলা হয়েছে যে আদিত্য রশ্মি গবনশীল চন্দ্রমণ্ডলে অন্তর্হিত ত্বষ্টৃতেজ (সূর্যতেজ) প্রাপ্ত হন।

প্রতিদিন পূর্ব আকাশে সূর্য উদয় হয় এবং পশ্চিম আকাশে অস্ত যায়। উদয় থেকে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত দিবা ভাগ, আর অস্ত থেকে উদয় পর্যন্ত রাত্রি ভাগ। দুটি ভাগ প্রায় সমান (কখনও কখনও কম বেশি হয়)। মহাজাগতিক এই ঘটনা থেকেই দিনের ধারণা। সময়ের হিসেবে সূর্য যে অপরিহার্য এ ধারণা প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানীদের ছিল। প্রতিদিন যে সূর্যকে দেখা যায় তা যে এক এবং অভিন্ন সে সম্পর্কেও বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ডে সূর্য একটিই আছে একথা ঋগ্বেদে (৮।৫৮।২) সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। দিবা-রাত্রির কারণ হিসেবে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (তপঞ্চি কা ৪৪ অধ্যায়) লেখা আছে যে, সূর্যের সম্মুখভাগে দিন এবং বিপরীত ভাগে রাত্রি। বিষ্ণুপুরাণেও একটি শ্লোকে অনুরূপ কথা বলা হয়েছে।

দিনের হিসেব রাখতে সূর্য যে অপরিহার্য একথা প্রাচীন ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছিলেন। আবার এটাও বুঝেছিলেন যে মাসের হিসেব রাখতে সূর্যের চেয়ে চন্দ্রকে অবলম্বন করাই শ্রেয়। এক পূর্ণিমা থেকে আরেক পূর্ণিমা বা এক অমাবস্যা থেকে আরেক অমাবস্যার সময়কাল প্রায় ২৯ ১/২ দিন। এই হিসেবটাকেই তাঁরা একমাস বলে ধরে নিয়েছিলেন। বৎসরের হিসেব করতে আবার তাঁরা সূর্যকে অবলম্বন করলেন। তাঁরা লক্ষ্য করলেন যে চন্দ্রপথের কয়েকটি রাশিকে অবলম্বন করে সূর্য বারো মাসে একবার সম্পূর্ণ মহাকাশ পরিক্রমা করে। এই সময়কালই হল এক বৎসর। এ সম্পর্কে ঋগ্বেদে (১।১৬৪।৪৮) আছে, দ্বাদশ পরিধি, এক চক্র ও তিন নাভি। এখানে চক্রের অর্থ সংবৎসরাত্মক কালচক্র। এই হিসেবে সামান্য কিছু গরমিল আছে। ২৯ ১/২ দিনের পরিবর্তে ৩০ দিনে মাস এবং ১২ মাসে এক বৎসর ধরলে ৩৬০ দিনে এক বৎসর হয়। কিন্তু প্রকৃত হিসেবে ৩৬৫ দিন কয়েক ঘন্টায় এক বৎসর। এর ফলে পাঁচ বছরে প্রায় ৩০ দিনের অর্থাৎ এক মাসের গর মিল হয়। এই অতিরিক্ত মাসটিকে বলা হয় অধিকমাস। হিসেবের এই গরমিল সে যুগের বিজ্ঞানীদের জানা ছিল। তাই তারা কখনও কখনও ১৩ মাসে বৎসর ধরে চন্দ্র বৎসরের সঙ্গে সৌর বৎসরের সঙ্গতি বিধান করতেন। এই ত্রয়োদশ মাসটিকে মলমাস বলা হয়। এই অধিমাস বা মলমাসের কথা ঋগ্বেদে (১।২৫।৮) উল্লেখ আছে। বর্তমানে আমরা যে পঞ্জিকা বা বাংলা ক্যালেন্ডার ব্যবহার করি তাতে চান্দ্রমাসের নাম লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে চন্দ্র ও সৌর উভয় মাসের নামই উল্লিখিত আছে। ঋতু ভিত্তিক দু'ধরনের মাসের তালিকা দেওয়া হল (সারণি দ্রষ্টব্য)ঃ

মাসের নাম	ঋতু					
	শীত	বসন্ত	গ্রীষ্ম	বর্ষা	শরৎ	হেমন্ত
চান্দ্রমাস	ফাল্গুন চৈত্র	বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ় শ্রাবণ	ভাদ্র আশ্বিন	কার্তিক অগ্রহায়ণ	পৌষ মাঘ
সৌরমাস	তপস্ তপস্য	মধু মাধব	শুক্র শুচি	নভস নভস্য	ইষ উর্দ্ধ	সহস সহস্য

পুরাকালে বৎসরকে দু'টি ভাগে ভাগ করা হত। প্রথমভাগ 'উত্তরায়ণ' নামে পরিচিত এবং দ্বিতীয় ভাগের নাম দক্ষিণায়ন। সূর্য যখন মকর ক্রান্তিতে অবস্থান করে তখন উত্তরায়ণ শুরু। এই সময়কাল চলে সূর্যের কর্কটক্রান্তিতে পৌঁছানো পর্যন্ত। এরপর শুরু হয় দক্ষিণায়ন। অর্থাৎ সূর্যের কর্কটক্রান্তি থেকে পুনরায় মকর ক্রান্তিতে ফিরে আসা। যে সময় সূর্যের অবস্থান মকর ক্রান্তিতে সেই সময় চন্দ্রের অবস্থান পূর্ব-ফাল্গুনী নক্ষত্রে। চন্দ্রের এই অবস্থানকালে যে দিনটি পূর্ণিমা হত, সেই দিনটিকে বৎসরের শেষ দিন বলে গণ্য করা হত। এর পরের দিন থেকে শুরু হত নতুন বৎসর যার প্রথম মাস ফাল্গুন। বিজ্ঞানের ইতিহাস (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড একত্রে), সমরেন্দ্রনাথ সেন — শৈবা প্রকাশন বিভাগ, পৃঃ ১০০ (প্রথম খন্ড)।

তথ্য সূত্র ঃ

১। Ekendra Nath Ghosh, Studies in Rig-Vedic Deities- Astronomical and Meteorological, Tr of the Asiatic Society of Bengal, 1932. 2। S. R. Das, A short chronology of Indian Astronomy – Indian Historical Quartaly vol. 7.1931. ৩। প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস, কলিকাতা, ১৩৬৩। ৫। সুকুমার রঞ্জন দাশ, হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা, বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ, কলিকাতা, ১৩৫৩। ৬। সমরেন্দ্রনাথ সেন, বিজ্ঞানের ইতিহাস (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড একত্রে), শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, কলকাতা)। ৭। অরূপরতন ভট্টাচার্য, প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা।

সামাজিক দায়

আনন্দ'র সেদিনের কথাটার পর অক্ষতা যেন বিচলিত হয়ে উঠেছিল। আজও সেভাব কাটেনি। ওই ভাবে যে ছেলেটি তার কাছে কিছু চেয়ে বসবে অক্ষতাও তা ভাবতে পারেনি। অবশ্য আনন্দর চাওয়াটার মধ্যে কোনও দোষ নেই। কিন্তু তাই বলে অক্ষতারই বা কী করার আছে? এই বয়সে না হয় মহর্ষি রমণের (আশ্রমের) ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াবার দায়িত্বটা কাঁধে নিয়েছে। কিন্তু তাই বলে, একটা ছেলের পড়াশোনা চালাবার মতো বয়স ও অর্থ দুটির কোনটিই তার নেই। দৃষ্টিহীন আনন্দ'র অবস্থা অক্ষতা মনে মনে অনুভব করে। সে জানে আনন্দ'র একটু বেশি পড়ার আবদারটা অন্যায় নয়। অক্ষতার ছোটো বয়সে চিন্তাটা যেন আরও বড় হয়ে উঠল। সে ভাবছে মুখের ওপর আনন্দকে বলে দেবে — না ভাই, আমি তোমাকে পড়াতে পারব না। কিন্তু তা কী করে হয়? যারা পৃথিবীর আলো থেকে বঞ্চি ত তাদের দায়িত্ব থেকে মুখ সরিয়ে নিতে অক্ষতার বিবেকে বাধছিল।

আনন্দ পড়াশোনায় ভালো। অক্ষতাও চায় আশ্রমের এই ছোটো ভাইটি বড় হোক। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হোক, তার মুখ উজ্জ্বল করুক। আশ্রমের এই একটি ছেলেই তো আছে যে তার অক্ষতাদিদির দেওয়া হোম ওর্য়াকটা আগে দেখায়। দৃষ্টিহীন আনন্দ যেন অক্ষতার নিজের ভাইয়ের থেকে কোনও অংশে কম নয়। অক্ষতার বাড়িও আনন্দ গেছে। আনন্দ 'র উচ্চ শিক্ষার স্বপ্ন পূরণ করতে কী যে করা যায় তার কিছু-ই কূল কিনারা খুঁজে পাচ্ছিল না অক্ষতা। সে মনে মনে ভাবল, মা কেই বলা যাক আনন্দের কথাটা। অক্ষতার মা উচ্চ শিক্ষিতা, ব্যাঙ্গালোরের একটি কলেজের অধ্যাপিকা। সেই সঙ্গে কলেজের কম্পিউটার সায়েন্স-এর বিভাগীয় প্রধান।

মা'র কলেজের ছুটির দিন অক্ষতা একদিন প্রসঙ্গটা মায়ের কাছে তুললো।

অক্ষতা — মা তোমার আনন্দের কথা

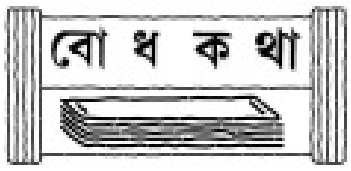

সতীনাথ রায়

মনে পড়ে?

মা, কোন্ আনন্দ বল তো? ওই আশ্রমের অন্ধ ছেলেটা?

অক্ষতা — হ্যাঁ, ওই ভাইটা।

মা — ওর আবার কী হল? ভালো আছে? অনেকদিন তো আমাদের এখানে আসেনি। খুব ভালো ছেলে। একবার নিয়ে আসিস।

অক্ষতা — এখন ও পড়াশোনায় ব্যস্ত। মা আমি বলছিলাম, ...

মা — হ্যাঁ বল, ঘাবড়াচ্ছিস কেন? আনন্দর কী হয়েছে?

অক্ষতা — না, ওর কিছু হয়নি। কিন্তু জানো মা, একদিন ওদের ক্লাস নিচ্ছিলাম। ক্লাসের শেষে আনন্দ আমার কাছে এসে বলল, দিদি, আমি আরও পড়তে চাই। তুমি আমাকে পড়াবে? আমরা তো গরীব, আমাদের তো অতো পয়সা নেই। আনন্দ'র পড়াশোনার খুব ইচ্ছা, কিন্তু আমি কী করে ওকে পড়াবো? আমার তো অত টাকাও নেই মা। মা মেয়ের কথায় প্রথমে কী বলবেন তা বুঝে উঠতে পারলেন না। একটু চুপ থাকার পর বললেন, অক্ষতা, তুই তোর জন্মদিনের খরচ থেকে কিছু টাকা বাঁচিয়ে ওর পড়ার খরচ চালা। অক্ষতা দেখল মা'র যুক্তিটা খারাপ নয়। তাই প্রথমে মনে মনে আনন্দ পেলেও পরে একটু অঙ্ক কষে নেওয়ার পর মা'কে বলল, মা জন্মদিন তো বছরে একবার, সেই টাকায় কী হবে?

মা চুপ করে রইলেন দেখে, অক্ষতা শেষমেশ মাকে বলেই ফেলল — মা, তুমি পারো না ওদের জন্য কিছু করতে? অক্ষতা কথাটা বলার পরই চমকে উঠল। মাকে কি সে জ্ঞান দিচ্ছে? অক্ষতা ভাবল, হয়ত মা খুব রেগে যাবেন। কিন্তু না, সেই ধরনের কিছু অঘটন ঘটল না। উল্টে মেয়ের কথায় মা'র চোখ খুলল। অক্ষতার মা দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। আজও তিনি আশ্রমকে সাহায্য করে চলেছেন। অনেক আনন্দই আজ আরও পড়াশোনার স্বপ্নকে সার্থক করতে পারছে।

ঘটনাটি ব্যাঙ্গালোরের। অনেক খবরের আড়ালে লুকিয়ে থাকলেও সমাজের বোধ জাগায় অক্ষতা ও তার মা'র এই ঘটনা।

চিত্রকথা ।। ভক্ত ও ভগবান ।। তেইশ

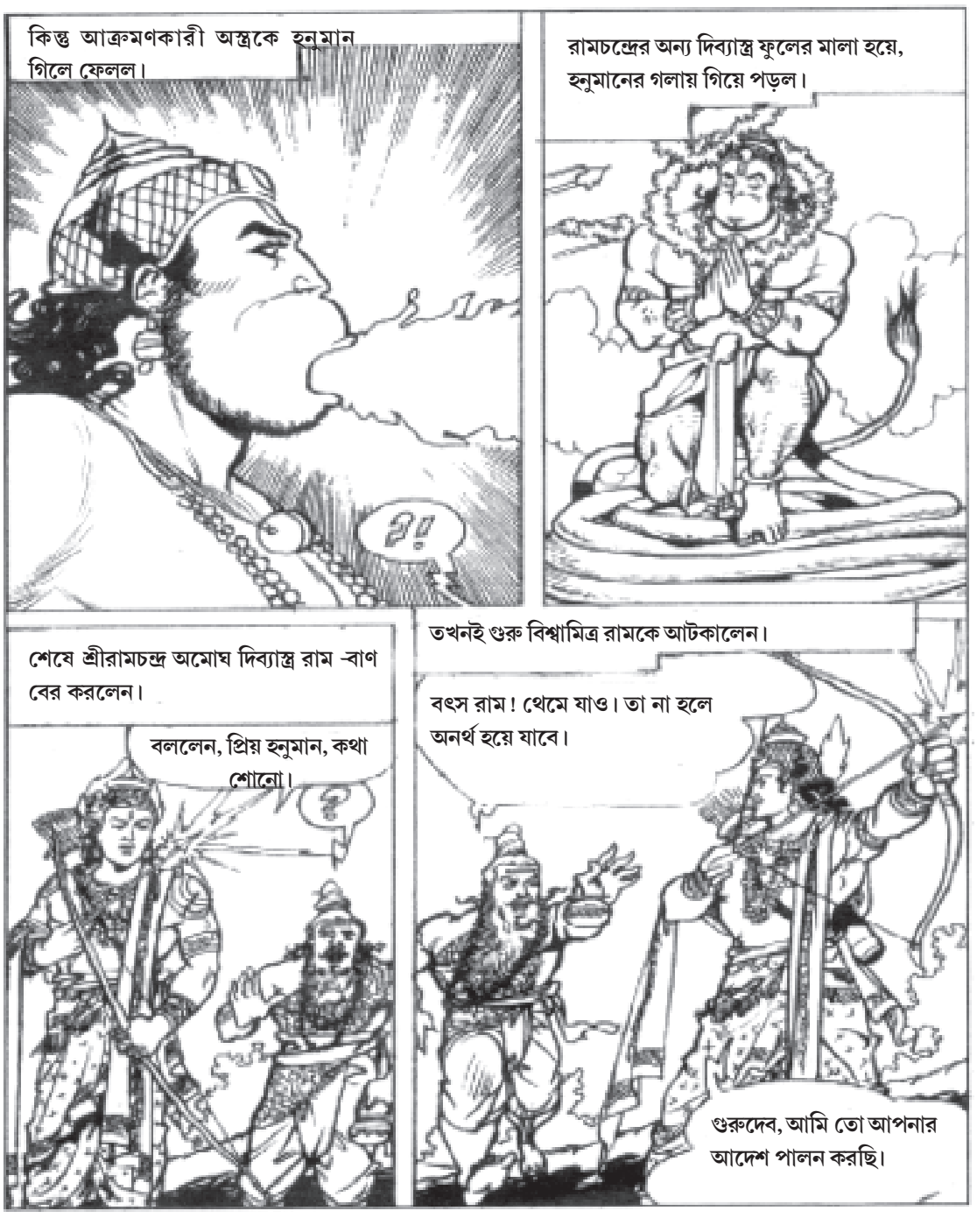

বিচিত্র খবর বিচিত্র গল্প

সাধারণ লোকে জমায় ডাক টিকিট, কয়েন, বই ইত্যাদি। কিন্তু জবরদস্ত বড়লোকদের কাজ কামই আলাদা। মার্কিন কোটিপতি ফ্রেড রেপকি-র হবি যুদ্ধের ট্যাঙ্ক সংগ্রহ করা। পঞ্চাশ-এর দশকে তিনি সেনাদলের ট্যাঙ্ক-বাহিনীর প্ল্যাটুন কমান্ডার ছিলেন, লড়েছেন কোরিয়ার যুদ্ধে। এখন সুযোগ পেলেই তিনি সস্তায় হরেকরকম ভাঙাচোরা ট্যাঙ্ক কিনে সেগুলির মেরামত করেন। এ পর্যন্ত রেপকির সংগ্রহে এসেছে চল্লিশটি ট্যাঙ্ক।

***

প্রতি বছর একটি জন্তুর নামে চীনাদের নববর্ষ পালিত হয়। এবার গেল ইঁদুরের বছর। তাই ধুম পড়ে যায় ইদুঁর কেনার। দোকানে দোকানে সবাই পাগলের মতো ইঁদুর কিনেছেন, প্রিয়জনকে উপহার দেবেন বলে। হুজুগের চোটে ইঁদুর বাড়ন্ত — শেষে অনেকে বেজি কিনে নিয়েছেন। উপহার হিসেবে অভিনব তো বটেই — নরম ছোট জন্তু, খেতে দেওয়ার ঝঞ্ঝাটও নেই, খুদকুঁড়ো নিজেই জোগাড় করে নেবে।

***

নারীকে অর্ধেক আকাশ বলে উল্লেখ করতেন চীনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান মাও-জে দং। কিন্তু তাঁর পছন্দ ছিল না চীনের আকাশে নারীর সংখ্যাধিক্য। তাই আমেরিকায় এক কোটি মেয়ে রপ্তানির প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তাতে নাকি দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বাড়ত। সেই সঙ্গে জনবিস্ফোরণ ঘটিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পায়ের মাটি আলগা করে দেওয়া যেত। ১৯৭৩ সালে মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরি কিসিংগারকে সরাসরি বলেওছিলেন, 'চীন বড় গরীব দেশ। তবে আমাদের দেশের মেয়ে উদ্বৃত্ত আছে। প্রচুর সন্তান উৎপাদন করে। কিন্তু সন্তান নিয়ে আমরা কী করব? তাই বলছি, চীন থেকে এক কোটি মেয়ে নিয়ে যান।'

***

তিনি গাছ ভালোবাসেন। তাই প্রকৃতির কাছাকাছি থাকতে ৬৫ বছরের একটি আম গাছকে ঘিরেই তৈরি করে ফেলেছেন স্বপ্নের এক তিন তলা বাড়ি। উদয়পুরের সিভিল ইঞ্জিনিয়ার কে পি সিংহের নজর ছিল, নির্মাণের কাজে গাছের যেন ক্ষতি না হয়। দু'টি শোবার ঘর, রান্নাঘর ও পড়ার ঘর নিয়ে, তাঁর এই অভিনব বাড়ি জায়গা করে নিয়েছে বিশ্বরেকর্ডের বইতেও। ফ্যান্টমের মতো তিনিও গাছবাড়িতে থাকতে পারছেন ভেবে বেজায় খুশি।

***

পুরুষ হয়েও টমাস বেটি অন্তসত্ত্বা হয়েছিলেন। এবার জন্ম দিলেন এক কন্যা সন্তানের। টমাস জন্মেছিলেন মেয়ে হয়ে। পরে লিঙ্গান্তর করে পুরুষ হন। কিন্তু তাঁর শরীরে স্ত্রী-অঙ্গ সক্রিয় ছিল। বিয়ের পর টমাসের স্ত্রী সন্তান ধারণে সফল হননি। তাই আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাহায্যে গর্ভধারণ করেছিলেন টমাস। অরিগনের হাসপাতালে তিনি মা হন।

***

নিউজিল্যান্ডের এক সমুদ্র সৈকতে আটকে পড়েছিল দু'টি তিমি। বহু মানুষের দেড় ঘন্টা চেষ্টাতেও তাদের সমুদ্রে ফেরানো যাচ্ছিল না। তিমিরাও অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। এমন সময় একটি ডলফিন এসে সোজা তাদের কাছে গেল এবং দেখা গেল, তিমিরা ডলফিনের পেছন পেছন দিব্যি সাঁতরে চলে যাচ্ছে সমুদ্রের গভীরে।

***

নোবেল পুরস্কার পাওয়ার দু'বছর পরও রবীন্দ্রনাথ নানা কারণে ভাবতেন, 'দিনরাত্রি মরবার কথা এবং মরবার ইচ্ছা আমাকে তাড়না করছে। মনে হয়েছে আমার দ্বারা কিছুই হয়নি, এবং হবে না, আমার জীবনটা আগাগোড়া ব্যর্থ। মরতে হবে।'

— নির্মল কর

কালিয়াগঞ্জ থেকে দশম শতাব্দীর মূর্তি উদ্ধার

হিন্দুস্থান সমাচার, কলকাতা।। কালিয়াগঞ্জের রাধিকাপুর থেকে দশম শতাব্দীর তিনটি মূর্তি উদ্ধার করল কাস্টমসের শিলিগুড়ির প্রতিরোধ শাখা। কাস্টমসের অতিরিক্ত কমিশনার বলেন, কালিয়াগঞ্জের রাধিকাপুর ও দেওয়ানগাঁও এলাকায় প্রাচীন মূর্তি লুকোনো আছে বলে গোপন সূত্রে খবর আসে। ওই খবরের ভিত্তিতে শিলিগুড়ি থেকে কাস্টমসের একটি দল কালিয়াগঞ্জ যায়। রাধিকাপুরের একটি ঝোপ থেকে তারা তিনটি প্রাচীন মূর্তি উদ্ধার করে। ওই মূর্তিগুলির একটি শিব, একটি গণেশ ও অপরটি সূর্য মূর্তি। পরীক্ষার পর জানা যায়, মূর্তিগুলি দশম ও একাদশ শতকের। মূর্তিগুলি অন্য জায়গা থেকে রাধিকাপুরে আনা হয়েছিল। সেখান থেকে শিলিগুড়ি হয়ে, সেগুলি নেপালে পাচারের উদ্দেশ্য ছিল। আন্তর্জাতিক চোরাবাজারে ওই মূর্তিগুলির দাম প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা বলে অনুমান করা হচ্ছে।

সার্ধ-শতবর্ষে একটি সমীক্ষা

(৮ পাতার পর)

দেখে লর্ড র‍্যাসের মতোই চমৎকৃত হয়েছিলেন। এ্যারিজোনা ন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনোমিক্যাল অবজারভেটরি'র অধ্যাপক ডি টি এমার্সন স্বীকার করেছেন যে বসু আবিস্কৃত 'ডুয়েল প্রিজম এটেনুয়েটার' প্রযুক্তি উক্ত অবজারভেটরির রেডিও টেলিস্কোপ নির্মাণের ভিত্তি যুগিয়েছে। জগদীশ বসু উদ্ভাবিত যন্ত্রগুলিও আই ই ই ই-র জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীবসুর গবেষণা পত্র "On the change of conductivity of metalic properties under cyclic electromotive variation" আসলে Solid State Physics সম্পর্কিত গবেষণাপত্র ছিল। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন 'Electric Eyc' যা আদতে মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করে কঠিন পদার্থ বিশ্লেষণ করার একটি যন্ত্র। কোহেরার উন্নয়নের সূত্রে তিনি লোহা পারদস্পর্শে ব্যবস্থাটিকে উন্নীত করলেন পালিশ করা ধাতব তারের সূক্ষ্ম স্পর্শে। এরপর ধাতব পাতের পরিবর্তে তিনি ব্যবহার করলেন বিভিন্ন ধাতব স্ফটিক। সীসার একটি স্ফটিক রূপ — গ্যালেনা ব্যবহার করে চমকপ্রদ ফল পেলেন। এই গ্যালেনাকেই তিনি Electric Eyc নাম দিয়েছিলেন। এটি ছিল বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত ট্রানজিস্টারের পূর্বপুরুষ। এরপর দৃশ্য ও অদৃশ্য আলোর সাথে 'প্যালেনা'র আন্তঃক্রিয়া লক্ষ্য করলেন অভাবিত এক তড়িৎ প্রবাহের উদ্ভব। ১৯০৪ সালে শ্রীবসু এটির পেটেন্টও করেছিলেন। তাঁর আবিস্কৃত তেজোমিটার আসলে ছিল 'ফটোভোল্টেয়িক কোষ'। শ্রীবসুর আর একটি গবেষণা পত্র ছিল 'The rotation of plane of Polarisation of Electric wave by a twisted structure." জন্ম দিল পদার্থবিদ্যার অরো একটি অত্যাধুনিক শাখার, যার নাম Micro wave analog Physics. ১৯০২ সালে তাঁর ভাষণ 'Electric response of metal and ordinary Plant" ইংল্যাণ্ড-এর উদ্ভিদবিজ্ঞানী এবং পদার্থবিদ উভয়ের প্রশংসা অর্জন করেছিল। তিনি দেখিয়েছিলেন যখন টিনের তারে স্পার্ক সৃষ্টি করা হয়, তখন পীড়ন-বিকৃতি থেকে উদ্ভূত হয় বিদ্যুৎ। তিনি দেখিয়েছিলেন একটি পেশী, একটি স্নায়ু এবং একটি গাছ উত্তেজনায় একইভাবে সাড়া দেয় এ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং তার ফলাফল উদ্ভিদকে প্রাণীরূপে চিহ্নিত করেছিল নিশ্চিতভাবে। উদ্ভিদের ওই সাড়াকে ১০ লক্ষ গুণ বড় করে দৃশ্যমান করার যন্ত্র তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন অদ্ভুত দক্ষতায়। তাঁর গবেষণা পত্র 'The response of inorganic matter to mechanical and electric stimulus" কে বলা যেতে পারে Cybernatics-এর প্রথম কাজ। বিজ্ঞানের জগতে এতগুলি কাজ থাকা সত্ত্বেও যথাযোগ্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি তাঁর মেলেনি। ডঃ গিবিনস্ বলেছেন "..... It is important that we fully recognise the tremendous innovation of Sir J. C. Bose in developing the millimeter wave technology, so long ago a technology which is now begining to the employed for Global Communications. বাইরের দেশের কথা ছেড়ে দিই। আমাদের দেশেই জগদীশ বসু অন্যান্য সাধারণ বৈজ্ঞানিক প্রতিভার সাথে এই প্রজন্মের ভারতীয়দের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি। জাতীয় স্তরে সেই প্রয়াসও যোগদানকারী ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের অনীহা দেখে লজ্জিত হতে হয়, হতাশ হতে হয় প্রায়শঃ। দুর্লভ মনীষা প্রিন্স ক্রোপট্কিন 'Class Struggle' তত্ত্বের পাশাপাশি 'Mutual Aid' তত্ত্ব উপস্থিত করে যিনি 'দৃশ্যমান' ছিলেন, আছেন সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে, তিনি জগদীশ বসুর পরীক্ষাগুলি দেখে বলেছিলেন আপনার Experiment এবং Argument পরম্পরার মধ্যে সূচ্যাগ্র প্রবেশ করাইবার ছিদ্র ন্দ্বঠ। আপনি অনেক আবরণ ছিন্ন করিয়াছেন, কিন্তু এজন্যই আপনাকে বহু প্রতিবাদ সহ্য করিতে হইবে"। এমন একটি সময়ে Royal Society তে আগত এক বৈজ্ঞানিক জগদীশ বসুর প্রাপ্তিগুলিকে নিজের বলে প্রচারের ষড়যন্ত্রও করেছিলেন। ভারতে আজকের দিনে অনেক সুযোগ সুবিধা প্রাপ্ত গবেষকদের জন্য সেই যুগে অনেক অসুবিধা ও প্রতিকূলতার মাঝে দৃঢ়প্রাতিজ্ঞ জগদীশ বসুর দৃষ্টিভঙ্গীর কথা স্মরণে রাখা বিশেষ দরকার; "পরীক্ষা সাধনে পরীক্ষাগারের অভাব ব্যতীত আরো বিঘ্ন আছে। আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই যে প্রকৃত পরীক্ষাগার আমাদের অন্তরে। সেই অন্তরতম দেশেই অনেক পরীক্ষা পরীক্ষিত হইতেছে। অন্তর্দৃষ্টি উজ্জ্বল রাখিতে সাধনার প্রয়োজন হয়। তাহা অল্পেই ম্লান হইয়া যায়, নিরাসক্ত একাগ্রতা যেখানে নাই, সেখানে বাহিরের আয়োজন ও কাজে লাগে না। কেবলই বাহিরের দিকে যাহাদের মন ছুটিয়া যায়' — সত্যকে লাভ করার চেয়ে দশজনের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যাহারা লালায়িত হইয়া উঠে তাহারা সত্যের দর্শন পায় না। সত্যের প্রতি যাহাদের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নাই, ধৈর্য্যের সহিত তাহারা সমস্ত দুঃখ বহন করিতে পারে না। দ্রুতবেগে খ্যাতিলাভ করিবার লালসায় তাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যায়।

এইরূপ চঞ্চলতা যাহাদের আছে, সিদ্ধির পথ তাহাদের জন্য নহে। কারণ দেবী সরস্বতীর যে নির্মল শ্বেতপদ্ম তাহা সোনার পদ্ম নহে তাহা হৃদয় পদ্ম।"

ভারতীয় সংস্কৃতি ও দর্শনে শ্রদ্ধাশীল ঋষিকল্প এই বিজ্ঞানী সম্পর্কে যথার্থই কবি সজনীকান্ত দাশের শ্রদ্ধার্ঘঃ

"সে কথা ভুলিনি কেহ অব্যক্তেরে করেছ প্রকাশ।

উপনিষদের ঋষি ঘোষিল যা বসি ধ্যানাসনেস/ চিন্ময় এ বিশ্বসৃষ্টি, জড়ে জীবে একই প্রাণাভাস /

সে সত্য পড়িল ধরা জ্ঞানী তব বিজ্ঞানী বীক্ষণে।"

দেরী হলেও সার্ধ শতবর্ষ পরে বর্তমান প্রজন্মকে এই সব বিজ্ঞানীদের অবদান সম্বন্ধে অবহিত করা আমাদের বিজ্ঞানীদের এক কর্তব্য বলে মনে করা দরকার।

(লেখক বাঁকুড়া খৃস্টান কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক)

বিজ্ঞানী ঋষি জগদীশ চন্দ্র বসু

(৯ পাতার পর)

অপূর্ব। অর্দ্ধ আমলকের উপর বজ্র চিহ্ন। সসাগরা ধরণীর অধিপতি অশোকের মতো জগতের মুক্তিহেতু সমস্ত বিতরণের পর যেমন অর্দ্ধ আমলকই অবশিষ্ট ছিল ঠিক তেমনি গবেষকের বিজ্ঞান সাধনার জন্য, জীবনের সমস্ত কিছু ত্যাগেই তার প্রকৃত মুক্তি। বজ্র যেমন নিষ্পাপ দধীচী মুনির অস্থি দ্বারা নির্মিত হয়েছিল, তেমনি যাঁরা পরার্থে জীবন দান করেন, তাঁদের অস্থি দ্বারাই বজ্র নির্মিত হয়, যার জ্বলন্ত তেজে জগতের দানবত্ব বিনাশ ও দেবত্বের প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে। এ সমস্ত কিছু চিন্তা-ভাবনা তাঁর ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য-এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধারই প্রতিফলন। জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞান রাজ্যের যে পথের সন্ধান দেখিয়েছেন সে পথ প্রাচীন ঋষিদের পথ — তা একের পথ। কি জ্ঞানে কি বিজ্ঞানে কি ধর্মে, কর্মে সেই পথ ছাড়া "নান্যঃ পন্থা বিদ্যাত্যেয়নায়"

ভারতের প্রাচীন ঋষিরা বলেছেন যে,এই যা কিছু সমস্ত জগৎ প্রাণেই কম্পিত হচ্ছে, জগদীশ চন্দ্র সেই ঋষিবাক্য প্রমাণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, ঋষিদের ভস্মাচ্ছন্ন হোম হুতাশন এখনো অনির্বাণ রয়েছে। এখনও তাঁরা ভারতবর্ষের অন্তঃকরণের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে বাস করছেন। এই কথার সমর্থন খুঁজে পাই ১৩২২ সালের শ্রাবণ মাসে, রামমোহন লাইব্রেরীর সভ্যগণ কর্তৃক আচার্য জগদীশ চন্দ্রের সম্বর্ধনা সভায় দর্শনাচার্য ডঃ ব্রজেন্দ্রলাল শীল মহাশয়ের ভাষণে। তিনি উল্লেখ করেছিলেন — মহাভারতের শান্তিপর্বে বৃক্ষের প্রাণবতা ও অনুভব শক্তির বর্ণনা আছে। বলা হয়েছে —

ভাম্বগ্নাশনি নিঘোষৈঃ ফলং পুষ্প, বিশীর্য্যতি। শ্রোত্রেণ গৃহ্যতে শব্দ স্তস্মাচ্চ শৃণ্বান্ত পাদপঃ। বায়ু, আগুন ও ব্রজের শব্দে বৃক্ষের ফল ও ফুল বিশীর্ণ হয়। কান দিয়ে শব্দ গৃহীত হয়। সুতরাং গাছেরা শোনে।

বল্লী বেষ্টয়তে বৃক্ষং, সবতশ্চৈ ব গচ্ছতি।

মহ্যদ্রষ্টুশ্চ মার্গোহস্তি তস্মাং পশ্যন্তি পাদপা ঃ

অর্থাৎ লতা গাছকে বেষ্টন করে। আর সর্বত্র যায়, যে নিশ্চিত রূপে দেখে না — তার পথ নেই। সুতরাং পাদপরা দেখে। তিনি এও বলেছিলেন এর মানে এই নয় যে, প্রাচীন ঋষিদের এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ছিল বা তাঁরা এ সব বিষয় আবিষ্কার করেছিলেন। এটা হল তাঁদের গভীর ধ্যানধারণা বা বিচক্ষণ পর্যবেক্ষণ শক্তির অভিজ্ঞতা প্রসূত। এর সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের ব্যবধান অনেক গভীর, অনেক বিস্তৃত।

জগদীশ চন্দ্র ভারতবর্ষকে এতখানি ভালোবাসতেন যে বহুবার বিদেশে যাওয়া সত্ত্বেও, তাঁর গৃহসজ্জায় বিদেশী পণ্য কোনও জিনিস দেখতে পাওয়া যেত না। বাঙালীর গ্রামবাংলার জীবন, তাঁদের খাবার, তাঁদের ব্যবহার, তাঁর কেমন প্রিয় ছিল তার একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যায়। একবার তিনি বিদেশ থেকে ফেরার পর কয়েকজন তাঁকে প্রণাম করতে গিয়েছিল। তখন বিকেলের জলযোগের সময়, সুন্দর সুন্দর ভালো দামী মিষ্টি আনা হয়েছে। তিনি বললেন, এ সব রাখ, মুড়ি আর কাঁচা লঙ্কা আন।" তা আনা হলে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে মুড়ি খেতে লাগলেন। যাতে মুড়ি মিইয়ে না যায় সে জন্য, তাঁর ল্যাবটেরিতেও মুড়ি কাঁচের ছিপি যুক্ত বড় কাঁচের পাত্রে রাখা থাকত।

জগদীশ চন্দ্রের সমস্ত সাধনার পিছনে ছিল ভারত-লক্ষ্মীর গৌরব বর্ধন করা। 'ভারত-লক্ষ্মী' তাঁর কাছে শুধু একটা শব্দমাত্র ছিল না — তাঁর একান্ত প্রাণের অন্তরতম অনুভূতি ছিল। রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর চিঠিগুলি পড়লেই পরিষ্কার বোঝা যায়। ভারতকে তিনি পশ্চিমী চোখ নিয়ে দেখেননি, দেখেছিলেন সম্পূর্ণ ভারতীয় চোখ নিয়ে। এটা বিশেষ লক্ষ্য করার জিনিস যে, জগদীশচন্দ্র ভারতের সমস্ত বড় বড় তীর্থে গিয়েছিলেন — সাধারণ হিন্দুযাত্রীর মন নিয়ে। কেদার বদরীর পথে যাত্রীদের 'কেদার বদরীর জয় শুনে তাঁর অন্তরাত্মা উল্লসিত হয়েছে, তিনি দেখেছেন অন্ধযাত্রী দুর্গম পার্বত্য পথে চলেছে নিঃশঙ্ক চিত্তে, লোকে তাঁকে হুঁশিয়ার হয়ে চলতে বলায়, সে অন্ধযাত্রী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছে —"তিনি আমার হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছেন, আমার আবার ভয় কিসের?" জগদীশ চন্দ্র তাঁর জীবনীকার গেডিস সাহেবের কাছে এই সব স্মৃতিকথা বলতে বলতে মন্তব্য করেছিলেন — "এসব অভিজ্ঞতা দিয়েই ভারত আমাকে তাঁর সন্তান করে রেখেছেন। সব কিছুর গভীরে তাঁর জীবন ও ঐক্যকে আমি অতি স্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করতে পারি। জগদীশ চন্দ্র তাঁর সমস্ত জীবন ধরে ভারতকে জেনেছেন। বন্ধু রবীন্দ্রনাথকে এক পত্রে একবার লিখেছিলেন — "আমি এতদিনে আমাদের জাতীয় মহত্ত্ব বুঝিতে পারিতেছি। ...বিদেশীয় নিন্দুকের কথায় চক্ষে আবরণ পড়িয়াছিল। এখন তাহা ছিন্ন হইয়াছে, এখন উন্মুক্ত চক্ষে যাহা প্রকৃত তাহা দেখিতেছি। আমাকে যদি শতবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে প্রত্যেকবার হিন্দুস্থানে জন্মগ্রহণ করিতাম।" লক্ষ্য করার বিষয় যে, জগদীশচন্দ্র কথাগুলি লিখেছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ একজন বন্ধুকে, রাজনৈতিক নেতাদের মতো জনসভায় হাততালি পাওয়ার জন্য তিনি বলেননি।

জগদীশচন্দ্র তাঁর আরাধ্যর মন্দিরে যাওয়ার জন্য বেছে নিয়েছিলেন বিজ্ঞানের পথ। বিজ্ঞানের সত্যকে অর্ঘ্য দিয়ে তিনি তাঁর বিধাতার অর্চনা করেছিলেন। সন্ন্যাসিনী নিবেদিতার স্নেহ ধন্য জগদীশচন্দ্র এই হিসাবে ছিলেন সত্যিকারের ঋষি। এই ঋষি তাঁর অর্ঘ্য হিসাবে যে ফুল নিয়ে গিয়েছেন সেই ফুলগুলোও ছিল তাঁর ঘাঁটি ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ এবং অভিনব দান হচ্ছে এই যে, জড়, উদ্ভিদ ও জীবের মধ্যে তিনি ঐক্য প্রমাণ করেছেন। ভারতের ঋষিরা যুগে যুগে সে সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন। ভারতের জনসাধারণ যে সত্যকে তাদের প্রতি কর্মে স্বীকার করে চলে, সেই ভারতআত্মার উপলব্ধ শ্রেষ্ঠ সত্যকে জগদীশচন্দ্র প্রমাণ করেছেন। তিনি বিদেশেও এই বিশ্বের একত্ব সম্বন্ধে ইংরাজীতে বহুবার বলেছেন যা কঠোপনিষদের নিম্নোক্ত শ্লোকের তাৎপর্য —

"একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপ বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেহণুপশ্যন্তি ধারাঃ
তস্মাৎ সুখং শ্বাশ্বতং নেতরেধাম।"

সর্ব্বভূতান্তরা একেশ্বর যিনি আপনার এক রূপকে বহু করেন, তাঁহাকে যাঁরা আত্মস্থ (আপনাদের মধ্য স্থিত) দেখেন, তাঁহাদের সুখ শ্বাশ্বত, অন্যদের নহে, বহুর মধ্যে এক কে যিনি জানেন — তিনিই সত্য জেনেছেন। অন্যরা নয়। এই মর্ম্মের উপনিষদ বাক্য তাঁর খুব প্রিয় ছিল — বহুর মধ্যে এই একের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন। এই জন্যই তাঁকে ঋষি বিজ্ঞানী বলা হয়।

অধিকাংশ বিজ্ঞানী নাস্তিক ও জড়বাদী। তাঁরা জড়ের দ্বারা চেতনের ও চেতনার ব্যাখ্যা করতে প্রয়াসী। তাঁরা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। হৃদয়, প্রাণ, মন, আত্মা যে শব্দই ব্যবহার করা যাক না কেন তার সমস্তই জড়ের কোন গুণ বা প্রক্রিয়ার ফল বোঝে। তাঁরা আত্মাকে অনাত্ম, শ্রেষ্ঠকে অশ্রেষ্ঠ দ্বারা ব্যাখ্যা করে জড়কেই একমাত্র সত্তা বলতে চান। কিন্তু জগদীশচন্দ্র ছিলেন এর বিপরীত মার্গে। তিনি বিশ্বের সর্বত্র প্রাণের আত্মার শ্রেষ্ঠ লীলা দেখতে ও দেখাতে চেয়েছিলেন। এখানেই তাঁর ভারতীয়ত্ব, তাঁর হিন্দুত্ব। কেননা তিনি ছোটবেলা থেকেই সেই ঋষিবাক্যের সাথে পরিচিত ছিলেন — "যদিদং কিঞ্চ জগৎ প্রাণ প্রজতি নিঃসৃতং", এই যা কিছু জগৎ-এ যা কিছু চলছে — তা প্রাণ থেকে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কম্পমান"। এই কম্পনের কথাই তিনি হাতে কলমে প্রমাণ করেছিলেন। তিনি প্রমাণ করেছিলেন ভারতবাসী শুধু দার্শনিক নয়, বৈজ্ঞানিক অভিযানেও সারা বিশ্বকে তাক লাগাতে পারে। অধ্যাপক র‍্যামসে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারে মুগ্ধ হয়ে ভারতবাসীকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। তিনি বলেছিলেন, "কেউ কেউ মনে করতে পারেন এখন থেকে ভারতের নতুন জ্ঞানযুগ শুরু হল। কিন্তু একটি কোকিলের ডাক বসন্তের সূচনা করে না।" জগদীশচন্দ্র সেদিন তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। সদর্পে ঘোষণা করেছিলেন, "বসন্ত যখন আসে তখন একটি মাত্র কোকিল আসে না; আসে ঝাঁকে ঝাঁকে, আমি বলছি ভবিষ্যতে ভারতের বিজ্ঞান-ক্ষেত্রে দলে দলে কোকিলের আগমন ঘটবে। ঘোষণা করবে ভারতের বুকে বসন্তের আগমন।"

জগদীশচন্দ্রের সেই আশা আজ অনেকটাই পূর্ণ হয়েছে। ভারতবর্ষ আজ চাঁদের বুকে পাড়ি দিয়েছে। এরপর ভারতীয় মহাকাশ বিজ্ঞানীরা সূর্যের জ্যোতির্বলয়ের অদূরে মহাকাশযান 'আদিত্য' পাঠানোর তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে। সৌরমণ্ডলের নির্গত গ্যাস নিয়ে গবেষণা করার উদ্দেশ্যেই এই অভিযান। সবই হচ্ছে, কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, আজকের ভারতবর্ষ দেশমাতৃকার সেই একনিষ্ঠ সেবক — প্রাচ্যের বিজ্ঞান সাধনার শ্রেষ্ঠ ঋত্বিক জগদীশচন্দ্রকে প্রায় ভুলতে বসেছে। বেদনাদায়ক হলেও এই নিষ্ঠুর সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই। নয়তো সত্যের অপলাপ হবে। যে কয়টি মহাজ্যোতিষ্ক ভারতীয় তথা বাঙালি জীবনকে ভাস্বর কর্মোদ্দীপ্ত করে গিয়েছে, তাঁদের মধ্যে জগদীশচন্দ্র অন্যতম — একথা বুঝে শুনে মনে প্রাণে উপলব্ধি করবার যোগ্যতা ও অধিকার আমাদের মতো কজন সাধারণ বাঙালির আছে, তা ভাববার মতো বিষয়। সত্যিই এ এক আশ্চর্য প্রশ্ন। জগদীশচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভার প্রকৃত মূল্যায়ণ এ পর্যন্ত কেন হল না এবং যেটুকু হল তাই বা শিক্ষিত সাধারণ বাঙালি সমাজ কেন অন্তর দিয়ে গ্রহণ করল না — এর জবাব কে দেবে।

সত্য দ্রষ্টা ঋষি-কবি লিখেছিলেন —
বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিম মন্দিরে
দূর সিন্দু তীরে
হে বন্ধু! গিয়েছ তুমি, সেথা হতে আনি
জয় মাল্য খানি।
দীনহীনা জননীর লজ্জানত শিরে
পরায়েছ ধীরে।

আবার কবে আসবে সেই বসন্ত? দীনহীনা জননী সেদিকে তাকিয়ে কেবলই দিন গুণছে।

(লেখক একটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক)

‘অপরাজেয় রামমোহন’-এর মতো নাটক নতুন করে অভিনীত হওয়া উচিত

দীপেন ভাদুড়ী

রামমোহন আধুনিক সভ্যতার জনক। কুসংস্কার এবং কুপ্রথার সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়। তাঁর সংস্কারে হিন্দুধর্ম সঠিক পথের আলোকে উদ্ভাসিত হয়। যদিও এর বিরুদ্ধ মতাবলম্বীর অভাব নেই। তাঁর কিছু কিছু কাজ বাদ দিলে তাঁকে হিন্দু ধর্মের সংস্কারক হিসাবে মেনে নিতে দ্বিধা হয় না। বর্তমান যুগে হিন্দু ধর্মের উপযোগিতা আমরা

রঙ্গম

মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। কুসংস্কারে আচ্ছন্ন কমবেশী অনেক ধর্ম। অন্যান্য ধর্মের থেকে এগিয়ে আমাদের সনাতন হিন্দু ধর্ম। কুসংস্কার বর্জন করার যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন রাজা রামমোহন রায় এবং বেশ কিছু কুপ্রথা তাঁর আন্দোলনে রদ হয়েছিল। যেমন সতীদাহ প্রথা, বাল্য বিবাহ প্রথা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তার সুফল প্রতিফলিত। প্রধানত সেই ঘটনা অবলম্বনে এই নাটক “অপরাজেয় রামমোহন” জয়ন্ত রসিক লিখিত, নির্দেশিত, অভিনীত। নাটকটি গত ২ নভেম্বর ’০৮ সন্ধ্যা ৬টায় কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট মঞ্চে ‘ইদানিং নাট্য গোষ্ঠি’-র কুশীলবরা উপস্থাপনা করলেন। আমরা দেখতে পাই রামমোহনের খেদোক্তি — “হত্যা, নারী হত্যা। ধর্মের নামে খুন। ধর্মের মাথায় বাজ পড়বে বৌঠান। তোমাকে বাঁচাতে পারলাম না। আমার অনুপস্থিতিই তোমার প্রাণ কেড়ে নিল। কিন্তু আমি আজ প্রতিজ্ঞা করছি বৌঠান, এই পৈশাচিক নরমেধ আমি বন্ধ করবো’। বুকের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়েও এই প্রথা বন্ধ করবোই। আমরা সংলাপের মাধ্যমে আরও শুনতে পাই রামমোহনের দৃঢ় অঙ্গীকার যে অঙ্গীকারে অর্ধ শিক্ষিত তথাকথিত ধর্ম ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে গর্জন করে উঠেছিলেন রামমোহন। যেমন — “গুরুদাস, তোমাকে দেখে আজ আমি ভরসা পাচ্ছি। তুমি আছো, উমা আছে, আমি এই সমাজের অন্ধকার দূর করবোই, একদিন আমার কথা মানুষ বুঝবেই।”

মানুষ বুঝেছিল। বুঝেছিল হিন্দু ধর্মের সংস্কার প্রয়োজন। হিন্দু ধর্মের আধুনিকতার ছোঁয়া প্রয়োজন। দরকার চিন্তাধারায় আধুনিক মনস্কতা, সেজন্য আজ হিন্দুধর্ম আধুনিক। কোনও কোনও ধর্ম যারা অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল অতীতে তাদের অর্থ সাহায্যের নামে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। এবং বর্তমানেও সে প্রথা চলছে। দরকার রামমোহনের মতো ব্যক্তি যে এসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে। অবশ্য রামমোহনের সব যুক্তি সকলের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। যেমন মূর্তি পূজায় বিশ্বাস না করা। হিন্দুর দেবপুজোকে মিথ্যা

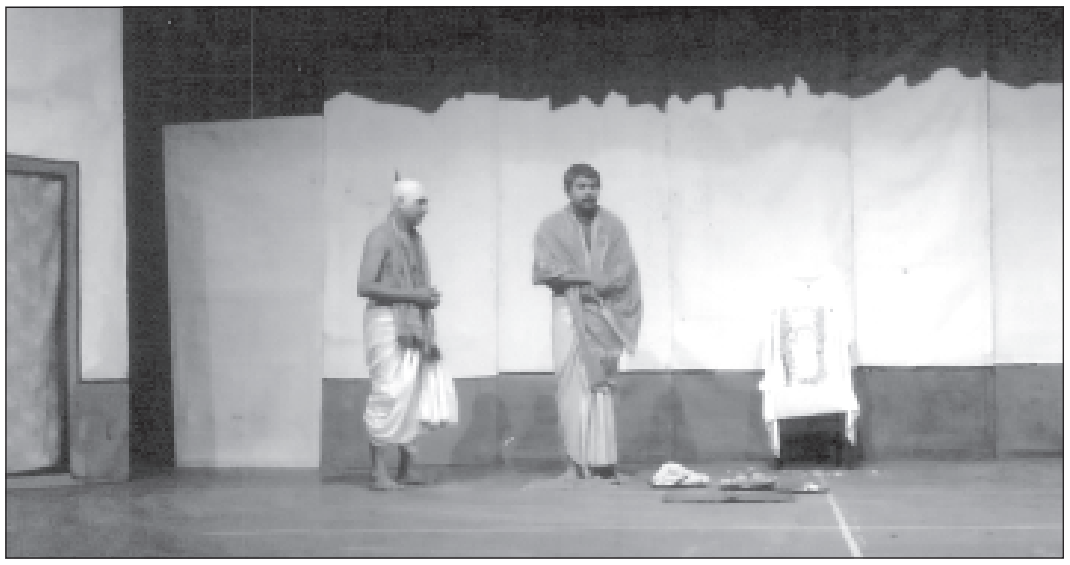

‘অপরাজেয় রামমোহন’ নাটকের একটি দৃশ্য।

প্রমাণ করার চেষ্টা। কিন্তু সব মানুষের ভালো এবং খারাপ বোধ থাকে। রামমোহনের খারাপ বোধ হলো এই মূর্তিপুজোয় বিশ্বাস হারানো। তাঁর ভালো দিক অর্থাৎ সতীদাহ প্রথা রদের আন্দোলন সমর্থন যোগ্য।

নাটকের সংলাপে পাই লর্ড বেন্টিঙ্ক -এর উক্তি — “রিলিজিয়ান ইজ ভেরী সেন্টিমেন্টাল ইস্যু রামমোহন।” রামমোহন এক জায়গায় বললেন, “খৃশ্চানদের ত্রিত্ববাদ নিয়ে সমালোচনা করেছি বলে, তারা রাগে ফুঁসছে।” এই ধরনের নানান সংলাপে সমৃদ্ধ এই সংস্কারমূলক নাটকটি বর্তমান যুগে আবার নতুন করে প্রচারিত, অভিনীত হওয়া উচিৎ — একথা মনে করেন উপস্থিত দর্শকদের একাংশ। মুহূর্মুহূ করতালির মাধ্যমে দর্শকবৃন্দ নাটকের কুশীলবদের উৎসাহিত করেছেন।

সবিতা বেগমের-এর তারিণী দেবী, জয়ন্ত রসিকের রামমোহন, সুশান্ত করের তারাচাঁদ দত্ত, নিখিলেশ বিশ্বাসের ডেভিড হেয়ার, গোলাম গাউসের দ্বারকানাথ, শাকিল আহমেদের পুরোহিত, দেবাশীষ নাইয়ার গুরুদাস-এর অভিনয় দর্শকদের ভালো লেগেছে। আবহসঙ্গীত মাত্রা অনুযায়ী পরিবেশিত হয়েছে। রামমোহনের কথা দিয়ে লেখা শেষ করছি। “যুগ যুগান্তরের কুসংস্কারে ওরা অন্ধ, কু সংস্কারের ভূতটাকে আগে দেশ ছাড়া করতে হবে।” আবার “সামনে গভীর অন্ধকার। চড়াই উৎরাই — অসমতল-সব। লড়াই করতে হবে গুরুদাস — লড়াই করতে হবে”। হ্যাঁ, ধর্ম নিয়ে লড়াই করতে হবে। করতে হবে অন্য ধর্মের অশুভ ছত্রছায়া থেকে মুক্ত করার।

আমাদের বেদ, উপনিষদ মিথ্যে হয়ে যায়নি। সংস্কারমুক্ত হিন্দু ধর্মকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। দর্শকের একাংশ এই ধরনের মন্তব্য করতে করতে মঞ্চ ত্যাগ করলেন

স্বপ্নের দৃশ্যের উপস্থাপনা, সুন্দর। সবশেষে বলি, সার্থক প্রচেষ্টা এই নাটকটি।

শব্দরূপ - ৪৮৭

নিলয় সাহা

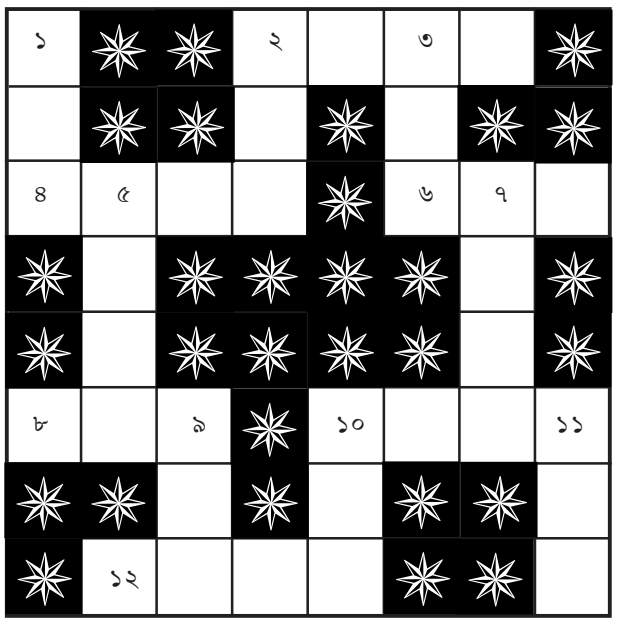

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. তৎসম বিশেষণে ক্রুদ্ধ চেহারাযুক্ত, ভয়ংকর রূপ, প্রথম দুয়ে শিব , ৪. টেলিগ্রাফ অফিস, ৬. শাকবিশেষ, প্রথম দুয়ে যন্ত্র, ৮. বাঁশের পাতলা চোকলা, দরমা, ১০. বিশেষণে একই সঙ্গে সাতটি গুলি ছোঁড়ার বন্দুক, ১২. বিশেষণে অবশিষ্ট, একে-তিনে জনক।

উপর-নীচ ঃ ১. কবির সৃষ্টি, ২. রক্ত সমার্থে এই রাক্ষস বশিষ্ঠ ঋষির পুত্র শক্তিকে ভক্ষণ করেন, ৩. তৎসম শব্দে ইঁদুর, একে-তিনে বাক শক্তি হীন, ৫. বিশেষণে কালার উঠে গেছে এমন, ৭. বিশেষণে উৎকণ্ঠিত বা অতি অস্থির, ৯. ফারসি শব্দে স্মরণ, স্মৃতি, ১০. ছোট চীনামাটি,কলাই প্রভৃতির থালা, শেষ ঘরে ইঙ্গ চাবি, ১১. প্রতি শব্দে লিপ্সা, লোভ, লোলুপতা প্রথম দুয়ে রক্তবর্ণ।

সমাধান শব্দরূপ ৪৮৫

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

ব	■	■	রো	জ	না	মা	■
লা	■	■	ক	■	টু	■	■
কা	ঠ	খ	ড়	■	কে	ন	না
■	ন	■	■	■	■	গ	■
■	ঠ	■	■	■	■	দা	■
কে	নে	ডি	■	ন	বী	ন	তা
■	■	জে	■	ও	■	■	লি
■	তা	ল	গো	ল	■	■	কা

● এই সংখ্যার সমাধান আগামী ১৫ ডিসেম্বর ২০০৮ সংখ্যায়।

নয়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামা সতর্ক পদক্ষেপ নিতে হবে দিল্লীকে

অর্ণব নাগ ।। ছ'য়ের দশকের আশপাশে আমেরিকায় ঘটে যাওয়া কয়েকটি ঘটনা পরপর সাজিয়ে দেওয়া হল। ১৯৫৫ সালে বসন্তের কোনও একদিন বাসে করে যাওয়ার সময় শ্বেতাঙ্গ সহযাত্রীকে আসন ছাড়তে অস্বীকার করে অনন্য নজির স্থাপন করেছিলেন কৃষ্ণাঙ্গ আন্দোলনের জননী রোজা পার্কস।

শু ১৯৬৩ সালে কাজের আর মত

দিল্লীর মাথাব্যথার কারণ এখন পরমাণু চুক্তি। নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বী ম্যাকেনের সঙ্গে পরমাণু চুক্তিতে সায় দিয়েছিলেন ওবামাও। শেষ পর্যন্ত আমেরিকা ও ভারতের মধ্যে পরমাণু চুক্তি স্বাক্ষর হয়ে গেলেও, এখনও পরমাণু প্রযুক্তি এবং জ্বালানি হস্তান্তর প্রক্রিয়াটাই সারা হয়নি। এরই মধ্যে ওবামা ও ডেমোক্র্যাটরা দাবি তুলেছেন — ভারতকে পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি সি টি বি টি-তে সই করতে হবে।

প্রকাশের স্বাধীনতার দাবিতে ওয়াশিংটন শহরে সংগঠিত হয়েছিল এক দীর্ঘ পদযাত্রা যা 'মার্চ অন ওয়াশিংটন' নামে খ্যাত। কৃষ্ণাঙ্গ আন্দোলনের আর এক পথিকৃৎ মার্টিন লুথার কিং-এর বিখ্যাত 'আই হ্যাভ আ ড্রিম' বক্তৃতা। সেই ঐতিহাসিক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, 'আমি স্বপ্ন দেখি, বর্ণবিদ্বেষের চোরাবালি থেকে মুক্ত হচ্ছে আমেরিকা।'

শু এর ঠিক দু'বছর পূর্বে ১৯৬১ সালে কৃষ্ণাঙ্গদের ভোটাধিকারের দাবিতে মুষ্টিবদ্ধ হাতে অ্যালবানির কারাগারে গান গেয়ে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন রুথা মে হ্যারিস।

ওই বছরই জন্ম হয় নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার। জন্মের আগে পরে ঘটে যাওয়া কৃষ্ণাঙ্গ আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ যে প্রভাব ফেলেছিল ওবামার মনে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তাই তাঁর জয় নিঃসন্দেহে এক দীর্ঘ লড়াই পেরিয়ে এসে অবশেষে কৃষ্ণাঙ্গ আন্দোলনের জয় হল। এই জয় একই সাথে বোধহয় আমেরিকায় প্রবাসী ভারতীয়দেরও জয়। স্বাধীনতার পূর্বে ভারতীয়দের বৃটিশদের কাছ থেকে বহুবার 'নেটিভ' শব্দটি শুনতে হয়েছে। ওবামার জয়ের পরে তাই আশুতোষ মুখোপাধ্যায় থেকে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের উত্তরসূরী বলে আজ ভাবতেই পারেন আমেরিকায় বসবাসকারী ভারতীয়রা। এক দমে শুনে যাওয়ার মতো কয়েকটি তথ্য পরিবেশন করা যেতেই পারে তাদের জন্য। তথ্যগুলি নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ এদেশের নাগরিকদের কাছেও। (১) বারাক হুসেন ওবামা হনুমানজীর ছোট একটি লকেট পরে থাকেন সবসময়।

(২) নতুন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিজের অফিসে গান্ধীজীর একটি বড় পোট্রেট টাঙিয়েছেন নিজেকে অহিংসার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য। (৩) নিজের আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন সিঙ্গাড়া (সমোসা) ও চাপাটির কথা। অকপটে স্বীকার করেছেন ভারতীয় ডালের প্রতি তাঁর প্রশ্নাতীত ভালোলাগার কথা। জানিয়েছেন যে তাঁর মা দিল্লীর ফোর্ড ফাউন্ডেশনে কর্মরতা ছিলেন। প্রচুর ভারতীয় বন্ধু ও ক্লাসমেটের কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি।

সুতরাং বলা যেতেই পারে আমেরিকা এমন একজন প্রেসিডেন্টকে পেয়েছে, যিনি তাঁদের পূর্বসূরীদের তুলনায় ভারতের অনেক কাছের লোক। তা সত্ত্বেও থেকে যায় একটা প্রশ্ন — তাঁর কূটনীতি কেমন হবে? তা ভারতীয় প্রতিরক্ষা থেকে শুরু করে অর্থনীতির ওপর কতটা প্রভাব ফেলবে তা বুঝতে গিয়ে কালঘাম ছুটে যাচ্ছে সাউথ ব্লকের কর্তাব্যক্তিদের। দিল্লীর মাথাব্যথার কারণ এখন পরমাণু চুক্তি। নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বী ম্যাকেনের সঙ্গে পরমাণু চুক্তিতে সায় দিয়েছিলেন ওবামাও। শেষ পর্যন্ত আমেরিকা ও ভারতের মধ্যে পরমাণু চুক্তি স্বাক্ষর হয়ে গেলেও, এখনও পরমাণু প্রযুক্তি এবং জ্বালানি হস্তান্তর প্রক্রিয়াটাই সারা হয়নি। এরই মধ্যে ওবামা ও ডেমোক্র্যাটরা দাবি তুলেছেন — ভারতকে পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি সি টি বি টি-তে সই করতে হবে। বুশ প্রশাসন কিন্তু এবিষয়ে একেবারে অনিচ্ছুক ছিলেন। যদি আমেরিকা এতে স্বাক্ষর করে তবে ভারতের ওপর চাপ অবশ্যই বাড়বে। বিশেষ করে ভারত ও পাকিস্তান উভয়ের স্বাক্ষর ছাড়া এ বিষয়ে সন্ধিপত্র কখনই হওয়া সম্ভব নয় বলে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শশি থারুরের অভিমত। ভারতীয় নীতি-নির্ধারকদের খুব ভাল করেই জানা উচিত পোখরানে পরমাণু পরীক্ষার পর এ বিষয়ে যে কোনও নিষেধাজ্ঞা আগামীদিনে পরমাণু কর্মসূচীর প্রভূত ক্ষতি করতে পারে।

আগামীদিনে সারা বিশ্বে শান্তির বাতাবরণ তৈরি করতে একদিকে যেমন জঙ্গি তৎপরতা মোকাবিলায় সক্রিয় হবার ইঙ্গিত দিয়েছেন ওবামা তেমনি বিভিন্ন পরমাণু অস্ত্র প্রসার রোধ চুক্তির মাধ্যমে ভবিষ্যতে পরমাণু-যুদ্ধের সম্ভাবনাকে নির্মূল করতে চাইছেন তিনি। কিন্তু এর জন্য তিনি যে পথ অবলম্বন করতে চলেছেন তা একদিকে যেমন বিতর্কের ইন্ধন যুগিয়েছে, তেমনই আবার অন্যদিকে এক আশঙ্কার সম্ভাবনাকেও ব্যক্ত করছে। ক্ষমতায় আসার পূর্বেই ওবামা, বলেছিলেন, 'সন্ত্রাসবাদকে শত্রু ভাবুক পাকিস্তান, ভারতকে নয়।' সেই কথার সূত্র ধরে ক্ষমতায় এসেই তিনি টার্গেট করেছেন পাকিস্তানের মধ্যে থাকা আল-কায়েদা ও তালিবানি ক্যাম্পগুলিকে যা যথেষ্ট ঘাবড়ে দিয়েছে ইসলামাবাদকে। সেই সঙ্গে পাক সরকার যাতে কাশ্মীর চিন্তা ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলে তালিবানি সন্ত্রাস ঠেকাতে সর্বশক্তি নিয়োগ করে সেইজন্য প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টনকে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে বিশেষ দূত হিসাবে পাঠানোর অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এটা করে তালিবানি সন্ত্রাসকে ঠেকাতে গিয়ে ওবামা পরোক্ষে কাশ্মীরে ইসলামাবাদ প্রযোজিত সন্ত্রাসকেই মদত দিচ্ছেন যার সুযোগ নিতে পাকিস্তান কখনই ভুল করবে না বলে

আবহাওয়া আন্তর্জাতিক

বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা। সাংবাদিক কে সুব্রামনিয়মের মতে ওবামা সরকারের শুরুতে ভারতকে যে সমস্যার মোকাবিলা সর্বাগ্রে করতে হবে তা হল ওবামা প্রশাসন এমন কিছু ব্যক্তিকে আবার প্রশাসনিক পদে ফিরিয়ে আনছেন যারা জেহাদী শক্তিকে মদত দেবার জন্য, তালিবানদের প্রতি উদারনীতি নেবার জন্য, সর্বোপরি চীন-পাকিস্তানকে পরমাণু প্রাচুর্য্য যথেচ্ছ অপব্যবহারের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য কুখ্যাত হয়ে রয়েছেন তারা। একদিকে ওবামা নিজেই কিছু কঠিন সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন নিজের বিশ্বাস ও রাজনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে। অপরদিকে ডেমোক্র্যাটিক পার্টিতে এমন কিছু প্রাক্তন কূটনীতিক, প্রাক্তন সেনা ব্যক্তিত্ব, প্রাক্তন গোয়েন্দা রয়েছেন যাদের পক্ষে পাকিস্তানের কাউন্টার পার্টস (পড়ুন তালিবান)-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এড়ানো কখনই সম্ভবপর নয়। তারাই হয়ত ক্লিন্টনের সময়কার পাক-আফগান সম্পর্ক নিয়ে স্পষ্ট কোনও ধারণা দিচ্ছেন না ওবামাকে। নচেৎ এটা হতে পারে না যে ওবামা জানতেন না বেনজির ভুট্টো সরকারই তালিবানের প্রতিষ্ঠাতা। পাকিস্তানি সেনা ও গুপ্তচর সংস্থা আই এস আই-এর সহযোগিতায় ক্লিন্টনের শাসনকালে ১৯৯৪ সালে ওই সন্ত্রাসবাদের জন্ম। এমনকী ক্লিন্টনের প্রশাসন তালিবানদের সঙ্গে পাইপলাইন চুক্তি নিয়ে অনেক দূর এগিয়েছিল। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সি আই এ-র সঙ্গে জেহাদীদের যৌথ প্রচেষ্টায় সৌদি জঙ্গি ও আই এস আই-এর জন্ম। আর বর্তমানে পাকিস্তানের পশ্চিম সীমান্তে পরপর ঘটে যাওয়া সন্ত্রাস ওই যৌথ ভুলেরই মাসুল। ওবামার এটা বোঝা উচিত পাকিস্তান কেবলমাত্র জেহাদী দর্শনের ওপর ভিত্তি করে ক্রমাগত কাশ্মীরের দাবি তুলেছে। ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ কাশ্মীরের ওপর একমাত্র ভারত ছাড়া আর কারুরই দাবি থাকতে পারে না। ওবামার পরামর্শে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে থাকা তালিবানদের বিরুদ্ধে লড়াই-এর পথ থেকে পাকিস্তানকে পালাবার সুযোগ করে দেওয়া হল বলে বিশেষজ্ঞ মহলের অভিমত। ইতিপূর্বে ভারত-পাক মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তৃতীয় পক্ষের সাহায্য ছাড়াই। এখনও ভারতেরই উদ্যোগে শান্তি প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। কাশ্মীর সমস্যা মোটেই আন্তর্জাতিক নয়, এটি একটি দ্বিপাক্ষিক সমস্যা আর আমেরিকার এতে নাক না গলালেও চলে!

ওবামার সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বিশ্বে বর্তমানে চলা আর্থিক মন্দা কাটিয়ে ওঠা। বিশেষজ্ঞরা একে তুলনা করছেন গ্রেট ডিপ্রেসনের সঙ্গে। ১৯২৯ সালে শেয়ার মার্কেটে ধস নেমে শোচনীয়ভাবে বিপর্যস্ত হওয়া মার্কিন অর্থনীতির ছবিটা ঠিক আজকের মতোই। যাকে অর্থনীতিবিদরা মহামন্দা বা গ্রেট ডিপ্রেসন নামে অভিহিত করেছিলেন। আজ বারাক হুসেন ওবামা যখন হোয়াইট হাউসের দ্বারে উপনীত তখন একের পর এক সংস্থা দেউলিয়া হয়ে পড়ছে, ধনতন্ত্রের ওপর নেমে এসেছে বিরাট আঘাত, প্রশ্ন উঠেছে পশ্চিমী ব্যাঙ্কগুলির বহুমাত্রিক ব্যাঙ্কিং পদ্ধতি নিয়ে, ধস নেমেছে শেয়ার মার্কেটে (এমনকি ওবামার জয়ের অব্যবহিত পরেও শেয়ার সূচক ক্রমশ নিম্নমুখী)। সবচেয়ে বড় কথা এই অর্থনৈতিক মন্দার আঁচ পড়েছে কমবেশি বিশ্বের সবদেশেই। এর থেকে পরিবর্তনের ডাক দিয়ে আজ ওবামা যেভাবে ক্ষমতায় এসেছেন সেইদিনও সেভাবে ক্ষমতায় এসেছিলেন রুজভেল্ট। তারপর অবস্থা বুঝে ধীরে ধীরে লর্ড কেইনস-এর 'নিউ ডিল' বা নতুন নীতি ঘোষণা করে আর্থিক দুরবস্থা সামাল দেন রুজভেল্ট। রুজভেল্টের দেখানো পথেই কি হাঁটবেন ওবামা? তিনি ইতিমধ্যেই তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে আউটসোর্সিং কার্যত তুলে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। এও বলেছেন যে সব বেসরকারি সংস্থা আউটসোর্স করবে না তাদের বিশেষ কর ছাড় দেওয়া হবে। এতে কিন্তু যথেষ্ট বিপাকে পড়বে ভারত। কারণ গত এক দশকে আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে বহু ভারতীয়ের কর্মসংস্থান হয়েছে এদেশে ও আমেরিকায়।

ওবামার পূর্বসূরী রুজভেল্ট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে গিয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলতে পেরেছিলেন মার্কিন অর্থনীতি। এই সঙ্কটকালে উত্তরণের জন্য ওবামাও কি সেরকম কোনও নীতি নিতে পারেন? এক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছাড়া আর সেরকম কোনও পরিকল্পনা আপাতত পরিলক্ষিত হচ্ছে না। তিনি ইতিমধ্যেই আরেক পূর্বসূরী বুশের নীতি মেনে ইরাক থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ইরানের সঙ্গে বোঝাপড়ার কথা বলেছেন, এছাড়া তিনি ইজরায়েল ও প্যালেস্তাইনের মতৈক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এগোবেন বলেই কূটনৈতিক মহলের ধারণা। চীন ও পাকিস্তান সম্পর্কে আগামীদিনে তিনি ঠিক কি ধরনের বিদেশ নীতি নেন তার দিকে কড়া নজর রাখতে হবে ভারতকে। এটা ঠিক ভারত সম্পর্কে আমেরিকার নীতিতে বিশেষ কোনও হেরফের হবে না। কিন্তু ইতিহাস এও সাক্ষ্য দেয় যে ভারত-মার্কিন সম্পর্ক ডেমোক্র্যাট্দের তুলনায় রিপাবলিকান প্রেসিডেন্টদের সময়কালেই তুলনামূলকভাবে ভাল গিয়েছে।

তবে ওবামা স্বাগত। এক কঠিন সময়ে হোয়াইট হাউসের দায়িত্ব নিতে চলেছেন তিনি। একদিকে বিপর্যস্ত অর্থনীতি, অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদে সন্ত্রস্ত বিশ্ব। এর সঙ্গে রয়েছে বিশ্বের কৃষ্ণাঙ্গ, নিপীড়িত মানুষের প্রত্যাশা। বাবার স্বপ্নকে (ওবামার আত্মজীবনী 'ড্রিমস' ফ্রম মাই ফাদার) কতটা বাস্তবে প্রতিফলিত করতে পারেন তিনি আগামী অন্তত চারবছরের জন্য সেইদিকেই তাকিয়ে থাকবে সমগ্র বিশ্ব।

Swastika
24 November - 2008, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে
স্বামী প্রণবানন্দ স্মারক বক্তৃতা

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ সম্পর্কে আজ পর্যন্ত সঠিক মূল্যায়ন হয়নি। গবেষকরাও তাঁর মতো মহাপুরুষের জীবন নিয়ে কোনও তথ্যনিষ্ঠ গবেষণা করেননি। বর্তমান প্রজন্মকে স্বামী প্রণবানন্দ সম্বন্ধে সচেতন করবার আবশ্যকতা তাই অনস্বীকার্য। এভাবেই 'সমাজ ও ধর্ম সংস্কারক স্বামী প্রণবানন্দ, স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠানে উপরোক্ত মন্তব্য করেন বিশিষ্ট বামপন্থী ঐতিহাসিক অধ্যাপক অমলেন্দু দে। গত ১৪ নভেম্বর কলকাতায় 'এশিয়াটিক সোসাইটি'-র পক্ষ থেকে সোসাইটির বিদ্যাসাগর সভাগারে এই বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছিল। সভার শুরুতে প্রাস্তাবিক ভাষণ দেন এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক রমাকান্ত চক্রবর্তী।

অধ্যাপক ডঃ দে তাঁর ভাষণে আচার্য স্বামী প্রণাবানন্দের ধর্ম, সমাজ সংস্কার, জনসেবা এবং দেশ ও জাতিগঠনে যে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছিলেন তা প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করেন। ফরিদপুর জেলার বাজিতপুর (বর্তমানে বাংলাদেশে) গ্রামে বিখ্যাত ভুঁঞা পরিবারে জন্মগ্রহণ করে সারা ভারতব্যাপী আর্ত, পীড়িত, অবহেলিত মানুষের কল্যাণে একক প্রচেষ্টায় যে কাজ ব্রহ্মচারী বিনোদ (স্বামী প্রণবানন্দ) শুরু করেছিলেন — তা আজ ভারত সেবাশ্রমরূপী বিরাট মহীরূহে পরিণত হয়েছে। যখনই দেশের যে কোনও প্রান্তে কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষ অসুবিধা ও কষ্টে পড়েন, তখনই সেখানে ছুটে গিয়ে মানুষের সেবায় লেগে পড়েন ভারত সেবাশ্রমের নিবেদিত প্রাণ সন্ন্যাসী ও কর্মীবৃন্দ। সেবার কাজে ধর্ম-বর্ণ-জাত-পাতের কোনও ভেদাভেদ তাঁরা কখনই বিচার করেন না। স্বামী প্রণবানন্দও প্রণব মঠেই সকল জাত-পাতের মানুষকে এক পংক্তিতে বসিয়ে, খাইয়ে চরম তৃপ্তিলাভ করতেন।

সুন্দরবন অঞ্চলের দুর্ভিক্ষে আচার্যের সেবাকাজের বারংবার উল্লেখ করেন অধ্যাপক দে। তিনি বলেন, ভারতবর্ষে কৃষি-ঋণ দেওয়ানোর প্রথম পদক্ষেপ স্বামী প্রণবানন্দই প্রবর্তন ও দাবি করেছিলেন — এ এক ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত।

এশিয়াটিক সোসাইটিতে স্বামী প্রণবানন্দের স্মারক বক্তৃতায় মঞ্চে রয়েছেন (বাঁদিক থেকে) ডঃ রমাকান্ত চক্রবর্তী, ডঃ অমলেন্দু দে, বিশ্বনাথ ব্যানার্জী ও দিলীপ ঘোষ।

এছাড়াও তীর্থক্ষেত্রে সংস্কার ও পাণ্ডাদের অন্যায় জুলুম বন্ধে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি।

সকলের প্রণবানন্দ সম্বন্ধে জানা, পড়া ও আলোচনা করা একান্তই আবশ্যক। প্রণবানন্দের দৃষ্টিকোণ কখনও সংকীর্ণতায় আবদ্ধ ছিল না। সভার শেষে ধন্যবাদ জানান এশিয়াটিক সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ দিলীপ ঘোষ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সোসাইটির সভাপতি বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের পক্ষে স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ, স্বামী যুক্তানন্দ সহ অন্য কয়েকজন সন্ন্যাসী ও ভক্তবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটির অনেক সদস্যও এদিন উপস্থিত ছিলেন।

লক্ষ্মণানন্দের হত্যকারীদের গ্রেপ্তার চাই

(১ পাতার পর)

উপর বলাৎকার হয়েছে বলে দেশে-বিদেশে ঢালাও প্রচার চলছে। অথচ ওই নান স্বয়ং তদন্তে সাহায্য করতে রাজী হচ্ছেন না। অসার যুক্তি দেওয়া হচ্ছে — পুলিশ-প্রশাসনের উপরে আস্থা নেই, কন্ধমাল তদন্ত কমিশনের উপর বিশ্বাস নেই। তাহলে তারা ওড়িশায় রয়েছেন কেন?

ভুবনেশ্বরে স্বামী লক্ষ্মণানন্দ সরস্বতীর শ্রদ্ধাঞ্জলি সভায় উপস্থিত বিশাল জনতার একাংশ।

নিরীহ গরীব জনজাতিদের সেবার নামে প্রলোভন দেখিয়ে খৃস্টান করা চলছে। এর বিরোধিতা করার জন্যই স্বামী লক্ষ্মণানন্দকে নিজেকে আহুতি দিতে হয়েছে।

সারা পৃথিবী জানে হিন্দুরা সহনশীল, কিন্তু হিন্দুরা যে ক্রুদ্ধ হতে পারে তা সবাই প্রায় ভুলেই গেছে। আজ ক্রুদ্ধ হিন্দুরা তাদের উপর এতদিন যে অন্যায় হয়ে চলেছে তার সমুচিতজবাব দিতে প্রস্তুত। আজকের সভায় তারই একটা ছোট্ট রূপ দেখা যাচ্ছে। একদিকে অত্যাচারী খৃস্টান সম্প্রদায়ের লোকেদের শরণার্থী শিবিরে সরকারি সাহায্যে আরামে রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, অন্যদিকে নিরীহ সাধারণ হিন্দু-জনজাতিদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে এবং নির্যাতন চালানো হচ্ছে।

এছাড়া সভায় বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সর্বভারতীয় নেতা ইন্দ্রেশকুমার। শ্রদ্ধাঞ্জলি সমিতির সভাপতি ডঃ রত্নাকর চৈনি এই সভায় পৌরোহিত্য করেন। অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে যারা উপস্থিত ছিলেন তারা হলেন স্বপ্রাণরূপানন্দজী, পুরীর স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী, স্বামী ভগবানদেব, অশোক সাহু, ডঃ ইন্দুলতা দাস, পশ্চিম ওড়িশার জনজাতি নেতা বুধা ওঁরাও, সবর সমাজের সভাপতি লচমন নায়ক, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রাজ্য সভাপতি বিপিন বিহারী রথ প্রমুখ। সঠিক অর্থে জনআন্দোলন এদিন থেকেই শুরু হল বলা যায়।

সভায় এদিন বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত হাজারের বেশি সাধু-সন্তের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য।

খোদ সিমি সভাপতির স্বীকারোক্তি

(১ পাতার পর)

এখনও ব্রেন ম্যাপিং ও নার্কো এ্যানালিসিস করা হয়নি কেন? স্বাধ্বী প্রজ্ঞার চারবার ব্রেন ম্যাপিং ও নার্কো এ্যানালিসিস করা হল শুধুমাত্র সন্দেহকে পুঁজি করে। কিছু না পাওয়া গেলেও মিথ্যে কেসে ফাঁসিয়ে তাকে আটকে রাখা হয়েছে কেন?

অন্যদিকে নাগোরি আরও সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আরিফ মহম্মদ আদতে নেপালী। তার সঙ্গে নাগোরির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। আরিফের মাধ্যমে নেপালেও সন্ত্রাস ছড়ানোর পরিকল্পনা করেছিল নাগোরি। পাকিস্তানভিত্তিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন লস্কর এ তৈবা-র আর্থিক মদতে এবং আই এস আই-র সাহায্যে বাংলাদেশ ও নেপাল সীমান্ত ব্যবহার করে ভারতে অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করা হোত। এমনকী দার্জিলিং-এও সেজন্য অস্ত্রভাণ্ডার গড়ার পরিকল্পনা ছিল। নাগোরি বলেছে — আরিফ তার সঙ্গে প্ল্যান-প্রোগ্রাম করেই মদিনা গিয়েছিল। সে জামিয়া মিলিয়াতে বি এ-র ছাত্র ছিল। নাগোরি আক্রমণকারী চীনের সঙ্গেও ভারতে নাশকতার জন্য সম্পর্কসূত্র স্থাপন করেছিল। এব্যাপারে দায়িত্ব পালন করেছিল সিমি'র পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি আজিজুল হক। আজিজুল একজন পুলিশকে মেরে দুজন সন্ত্রাসবাদীকে চীনে পালানোর বন্দোবস্ত করেছিল।

শুধু তাই নয়, দার্জিলিং জেলার শালিগুডাতে এক আত্মীয়ের বাড়িতে অস্ত্রশস্ত্র জমা করার পাকা ব্যবস্থা করেছিল আজিজুল। সেখান থেকে সে নিয়মিত নেপালে যাতায়াত করে লস্কর এ তৈবা'র সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখত। দিল্লীর ইংরাজি দৈনিক 'দি পায়োনীয়র' নারকো এনালিসিস্ টেস্টে-এ যুক্ত এক ডাক্তারের সঙ্গে কথাবার্তা বলেই এসব তথ্য প্রকাশ করেছে। বাঙ্গালোরের ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে ওই ব্রেন ম্যাপিং এবং নারকো এনালিসিস হয়। নাগোরি আরও বলেছে, সিমি'র প্রাক্তন সভাপতি সাহিদ বদর ফালাহি অস্ত্রশস্ত্র জড়ো করার ব্যাপারে দারুণ সক্রিয় ছিলেন। সিমি'র দেশজোড়া সন্ত্রাসী কাজকর্মের জালের সাহায্যে মুম্বই-এর মুসলমানদের রক্ষা করতে মুম্বই পুলিশের দয়া নায়েক-এর মতো বহুকথিত এনকাউন্টার স্পেশালিস্টদেরকে টার্গেট করেছিল।

নাগোরি জানিয়েছে, মহারাষ্ট্রে সিমির শত শত ক্যাডার রয়েছে। তারাই মুম্বাই-এ ট্রেনে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, নাগপুরে মুসলমান সন্ত্রাসবাদীরা আর এস এস-এর প্রধান কার্যালয়েও হামলা চালিয়েছিল। দু'জন সন্ত্রাসবাদী পালিয়ে যায় এবং দুজন পুলিশের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে মারা পড়েছিল — এটা ২০০৭-এর ঘটনা।

নারকো টেস্টে নাগোরি বলে দিয়েছে যে, মহারাষ্ট্রবাসী আসিফ খাঁন মুম্বই-এর ট্রেনে বিস্ফোরণ ও আওরঙ্গাবাদ বিস্ফোরণে যুক্ত ছিল। আসিফ তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

নির্ভীক জাতীয়তাবাদী
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান

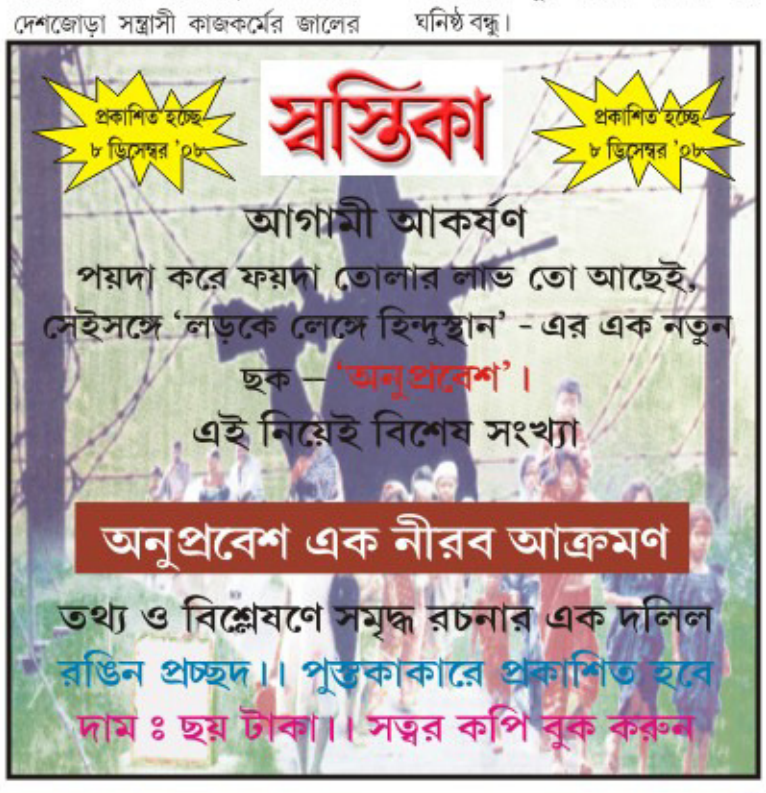

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com